Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ
শিরকের ভয়াবহতা

<u>তত্ত্বাবধায়নেঃ</u>

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

<u>জমা দিয়েছেনঃ</u>

হাসনাত নুরানি
রোল: ২২৭০১০৬১৬

তারিখঃ ২৯ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ
শিরকের ভয়াবহতা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

<u>ত্বত্তাবধায়নেঃ</u>

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ বিভাগ

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

<u>জমা দিয়েছেনঃ</u>

হাসনাত নুরানি

রোল: ২২৭০১০৬১৬

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "শিরকের ভয়াবহতা" বিষয়ক থিসিস টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে হাসনাত নুরানী, আইডিঃ ২২৭০১০৬১৬ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ বিভাগ

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

মুফতিঃ মুজিবুর রহমান

আকিদাহ ও ফিকহ বিভাগ

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা - আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "শিরকের ভয়াবহতা" শিরোনামে এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওঃ আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন অভিসন্দর্ভ রচনা করেননি।

hasnat

হাসনাত নুরানী

আইডিঃ ২২৭০১০৬১৬

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২৯ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

ভুমিকা

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য, দুরূদ ও সালাম সর্বশেষ নবি ও আল্লাহর রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ও তাঁর সাহাবীগণের ওপর।

শির্ক শব্দটি মুসলিম, অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের কাছে একটি পরিচিত শব্দ। শির্কের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে হয়ত অনেকেরই সঠিক ধারণা নেই, আবার শির্কের বাস্তবতা বা শির্ক সংঘটনের বিভিন্ন বাস্তব পন্থা সম্পর্কেও অনেকেরই সঠিক ধারণা নেই। তাই সমাজের বিভিন্ন স্তরে শির্ক প্রচলিত রয়েছে। মহান আল্লাহ্ তা'আলা তাওহীদ প্রতিষ্ঠার লক্ষে সত্যের দিশারী রূপে যুগে যুগে অসংখ্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। সর্বশেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাওহীদের বাণী প্রচার ও সত্যের আহ্বানের সাথে সাথে শিরকের মূলোৎপাটনের জন্য ছিলেন সোচ্চার। প্রতিটি মানুষেরও ঈমানী দায়িত্ব হচ্ছে নিজেকে তাওহীদ ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখা এবং সেই সাথে অন্যদেরকেও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে শির্ক বর্জিত আমল করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা।

জাতি হিসেবে আমরা শংকর জাতি। আমাদের সমাজে বিভিন্ন ধর্মীয় সংস্কৃতির মিশ্রণ রয়েছে। দীর্ঘদিন ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে আমাদের সমাজে ইসলামের মধ্যে বহু অনৈসলামিক সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। ধর্মকে আমরা অনেকটা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়েছি, যেখানে রয়েছে পর্যাপ্ত শিক্ষার অভাব। তাই প্রকৃত ইসলামের চেতনা আমাদের মধ্যে অনেকটাই অনুপস্থিত। আমরা শুধু পূর্ব-পুরুষদের আচার আচরণের মধ্যেই ধর্মকে সীমাবদ্ধ রাখতে শিখেছি। আমাদের সমাজের অনেক আলেমগণের অবস্থাও অনেকটা তদ্রপ। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি তারাও কোরআন ও হাদিসকে পাশ কাটিয়ে কিছু প্রচলিত পুস্তকের উপর নির্ভর করেই কোনভাবে চালিয়ে নিচ্ছে ধর্মীয় চর্চা। সেক্ষেত্রে সমাজের অধিকাংশ মানুষই ইসলামের প্রকৃত জ্ঞান থেকে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে, ফলে শির্কের মত কঠিন অপরাধগুলো সংঘটিত হয়ে চলছে।

এই লিখাতে কোরআনের কয়েকটি তফসীর গ্রন্থ যেমন, **তাফসীর ইবনে কাসীর, তাফসীরে তাবারী, তাফসীর ফি-যিলালীল কোরআন, তাফসীরে আবু বকর জাকারিয়া** এবং সহীহ হাদিস গ্রন্থের মধ্যে **বোখারী শরীফ, মুসলীম শরীফ, তিরমিযী শরীফ ও আবু -দাউদ শরীফ সহ আর কিছু সহীহ হাদীস গ্রন্থের** সাহায্য গ্রহন করেছি। এ ছাড়াও ড. মোঃ সেলিম রেজা সম্পাদিত "**শিরক**", ডঃ মুয্যাম্মিল আলী প্রনীত **'শির্ক কি এবং কেন?'** মোস্তাফিজুর রহমান সম্পাদিত "**বড় শিরক কি ও কত প্রকার**", নুরজাহান_বিনতে_আব্দুল_মজিদ সম্পাদিত "**শিরকের বেড়াজালে উম্মত বেসামাল**", গ্রন্থগুলো ও ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রবন্ধের সহায়তা নিয়ে এ রচনাটি সম্পাদন করেছি। এ রচনার মধ্যে অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটি থাকতে পারে। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি এবং প্রার্থনা করছি তিনি যেন আমার অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটি মার্জনা করেন এবং সবশেষে মহান আল্লাহ তা'আলার নিকট করুণা ভিক্ষা করছি।

শিরক কি?

وَإِذْ قَالَ لُقْمَـٰنُ لِٱبْنِهِۦ وَهُوَ يَعِظُهُۥ يَـٰبُنَىَّ لَا تُشْرِكْ بِٱللَّهِ ۖ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ١٣

অর্থঃ স্মরণ কর, যখন লুকমান তার ছেলেকে নসীহত ক'রে বলেছিল- হে বৎস! আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শিরক কর না, **শিরক হচ্ছে অবশ্যই বিরাট যুলম।** **(সুরা লুকমান, আয়াত ১৩)**

আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করাকে শিরক বলা হয়। সেটা একক স্রষ্টার মর্যাদার সাথে হোক, তাঁর গুণাবলী ও তাঁর ইবাদত সমূহের সাথে হোক। এমনটি মনে করা যে আল্লাহ ছাড়া অন্যরাও আহারদাতা, জীবন ও মৃত্যর মালিক, ধনদৌলত, সন্তানাদী, উপকার অপকারের ক্ষমতা রাখে। ইবাদতগুলোর মধ্য হতে কোন ইবাদত অন্য কারো জন্য সাব্যস্ত করা। যেমন ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত, দো'আ, মানত কুরবানী, ভালবাসা, ভয়ভীতি, ইত্যাদি অন্য কারো জন্য করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপ আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর মধ্যে কোন ধরনের বিকৃতি বা অস্বীকৃতির মাধ্যমে শিরক করা। সমাজে বহু শিরকী কাজ চালু রয়েছে। যেমন মাযার ও কবরপূজা, মাযারে শিরনী দেয়া, কবরবাসীর কাছে কিছু চাওয়া, কবরে চাদর চড়ানো, ফুল দেয়া, মানত করা, তাবীয লটকানো, গায়রুল্লার নামে যবহ করা ও কসম করা ইত্যাদি।

শারঈ পরিভাষায় শিরক হল- আল্লাহর সাথে অন্য কোন অংশীদার বা সমকক্ষ নির্ধারণ করা; আল্লাহর রুবূবিয়্যতের ক্ষেত্রে কিংবা ইবাদতের ক্ষেত্রে কিংবা তাঁর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَٰشًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِۦ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا۟ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٢

যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বিছানা ও আকাশকে ছাদ করেছেন এবং আকাশ হতে পানি বর্ষণ ক'রে তদ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন, কাজেই জেনে বুঝে কাউকেও আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করো না। (সূরা আল-বাক্বারাহ: ২২)

শিরক মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। আল্লাহ তাআলা মানুষের শিরকের গোনাহ ক্ষমা করবেন না। তাওহিদের শ্রেষ্ঠ আহ্বান হলো শিরকে আকবর থেকে বিরত থাকা। কারণ সরাসরি আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক করাই হলো শিরকে আকবর বা বড় শিরক।

শিরকের প্রকারভেদ

কুরআন-সুন্নাহর দ্ব্যর্থহীন দলীলগুলো প্রমাণ করে যে, শিরক কখনও ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয়। আবার কখনও কখনও ইসলাম থেকে খারিজ করে না। তাই আলেমগণ শিরককে দুইভাগে ভাগ করার পরিভাষা গ্রহণ করেছেন: **বড় শিরক ও ছোট শিরক।**

বড় শিরক হল- যেটি নিরেট আল্লাহর অধিকার এমন কোন অধিকার আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে প্রদান করা; সেটা আল্লাহর রুবুবিয়্যত (প্রভুত্ব)-এর ক্ষেত্রে হোক, কিংবা উলূহিয়্যত (ইবাদতে)-এ হোক, কিংবা তাঁর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে হোক। এ প্রকারের শিরক কখনও প্রকাশ্য হতে পারে: যেমন- মূর্তি ও প্রতিমাপূজারীদের শিরক কিংবা কবর, মৃতব্যক্তি ও অনুপস্থিত ব্যক্তি-পূজারীদের শিরক। আবার কখনও কখনও অপ্রকাশ্যও হতে পারে। আল্লাহ ব্যতীত অন্য সব উপাস্যের উপরে যারা তাওয়াক্কুল করে, কিংবা মুনাফিকদের শির্ক ও কুফরের মত। কেননা মুনাফিকদের শিরক যদিও বড় শিরক, ইসলাম থেকে খারিজকারী শিরক, এই শিরককারী স্থায়ী জাহান্নামী; কিন্তু এটি গোপন। যেহেতু তারা বাহ্যতঃ ইসলাম প্রকাশ করে এবং কুফর ও শিরক গোপন রাখে। তাই তারা গোপনে মুশরিক; প্রকাশ্যে নয়। এই শিরক কখনও কখনও বিশ্বাসগত বিষয়গুলোতে হতে পারে: যেমন ঐ সব লোকদের বিশ্বাস যারা বিশ্বাস করে যে, এমন কিছু সত্তা রয়েছে যারা আল্লাহর সাথে সৃষ্টি করে, জীবন দেয়, মৃত্যু দেয়, মালিকানা লাভ করে এবং এ বিশ্ব পরিচালনা করে। কিংবা এমন বিশ্বাস যারা করে যে, এমন কিছু ব্যক্তি রয়েছে যারা আল্লাহর মত নিঃশর্ত আনুগত্য প্রাপ্য। ফলে তারা সেসব ব্যক্তি যা হালাল করে ও যা হারাম করে সেক্ষেত্রে তাদের আনুগত্য করে; এমনকি সেগুলো যদি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর শরী'আতের বিপরীত হয় তবুও। কিংবা আল্লাহর ভালবাসা ও আল্লাহকে সম্মানপ্রদর্শনের ক্ষেত্রে শিরক: অর্থাৎ আল্লাহকে যেভাবে ভালোবাসে কোন মাখলূক্বকে ঠিক সেইভাবে ভালোবাসা। এটি এমন শিরক যা, আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। এই শিরক সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ ۗ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا۟ إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ (সূরা আল-বাক্বারাহ: ১৬৫)

আর কোন কোন লোক এমনও আছে, যে আল্লাহ ছাড়া অন্যান্যকে আল্লাহর সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে, আল্লাহকে ভালবাসার মত তাদেরকে ভালবাসে। কিন্তু যারা মু'মিন আল্লাহর সঙ্গে তাদের ভালবাসা প্রগাঢ় এবং কী উত্তমই হত যদি এ যালিমরা শাস্তি দেখার পর যেমন বুঝবে তা যদি এখনই বুঝত যে, সমস্ত শক্তি আল্লাহরই জন্য এবং আল্লাহ শাস্তি দানে অত্যন্ত কঠোর।

(সূরা আল-বাক্বারাহ: ১৬৫)।

যেমন, অনেকেই এমন ধারণা পোষণ করেন যে, মানুষ ইবাদাত করতে করতে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, সে তখন দুনিয়ার প্রতিটি বস্তুর মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলাকে স্বয়ং দেখতে পায় অথবা দুনিয়ার প্রতিটি বস্তুকে আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্বের বিশেষ অংশ হিসেবে মনে করে। এ পর্যায়কে সূফীদের পরিভাষায় "ওয়াহ্দাতুল্ উজূদ্" বলা হয়। এভাবে মানুষ আরো বেশি বেশি আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদাত করতে থাকলে সে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, তখন তার অস্তিত্ব আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্বের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। তখন আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর বান্দাহ্'র মাঝে আর কোন ব্যবধানই থাকে না। এ পর্যায়কে সূফীদের পরিভাষায় "ওয়াহ্দাতুশ্ শুহূদ্" বা "ফানা ফিল্লাহ্" বলা হয়। এভাবে মানুষ আরো বেশি বেশি আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদাত করতে থাকলে সে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, তখন আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব তার অস্তিত্বের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। এ পর্যায়কে সূফীদের পরিভাষায় "হুলূল্" বলা হয়। মূল কথা বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে, এ পরিভাষাগুলোর মাঝে কোন ফারাকই নেই। কারণ, সবগুলোর মূল কথা হচ্ছে, মানুষ তথা আল্লাহ্ তা'আলার সকল সৃষ্টি তাঁরই অংশ বিশেষ মাত্র।

সূফীগণ "'হুলূল" ও "ওয়াহ্দাতুল্ উজূদে" বিশ্বাস করার দরুন তাঁরা মনে করেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা এককভাবে যা করতে পারেন তাঁরাও তা করতে পারেন। তাই তো মনে করা হয়, তাঁরা বিশ্ব পরিচালনা করেন। গাউসের নিকট রয়েছে সব কিছুর চাবিকাঠি। চার জন কুতুব গাউসেরই আদেশে বিশ্বের চার কোণ ধরে রেখেছেন। সাত জন আব্দাল গাউসেরই আদেশে বিশ্বের সাতটি মহাদেশ পরিচালনা করেন। আর নজীবগণ নিয়ন্ত্রণ করেন বিশ্বের প্রতিটি শহর। প্রত্যেক শহরে একজন করে নজীব রয়েছেন। হেরা গুহায় তাঁরা প্রতি রাত্রে একত্রিত হন এবং সৃষ্টিকুলের ভাগ্য নিয়ে খুব নিবিড়ভাবে তাঁরা চিন্তা করেন। তাঁরা জীবিতকে মারতে পারেন এবং মৃতকে জীবিত করতে পারেন। বাতাসে উড়তে পারেন এবং মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারেন ; অথচ কোর'আন ও হাদীসের দৃষ্টিতে এ সবগুলো একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই করতে বা করাতে পারেন। অন্য কেউ নয়। (বড় শিরক কি ও কত প্রকার সম্পাদনায়ঃ মোস্তাফিজুর রহমান)

শিরকে আকবর কারির পরিনতি

শিরক মানুষকে তাওহিদ তথা একত্ববাদ থেকে বের করে দেয়। যাদেরকে আল্লাহ তাআলা কখনো ক্ষমা করবেন না। তাদের ব্যাপারে কুরআনুল কারিমে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন-

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَىٰٓ إِثْمًا عَظِيمًا ٤٨

নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করা ক্ষমা করবেন না। এটা ছাড়া অন্য সব যাকে ইচ্ছে মাফ করবেন এবং যে আল্লাহর সাথে শরীক করল, সে এক মহা অপবাদ আরোপ করল।(সুরা নিসা : আয়াত ৪৮)

এটা জানা আবশ্যক যে, যুলুম ও অবিচার তিন প্রকার। এক প্রকার যুলুম যা আল্লাহ্ তা'আলা কখনো ক্ষমা করবেন না। দ্বিতীয় প্রকার যুলুম যা মাফ হতে পারে। আর তৃতীয় প্রকার যুলুমের প্রতিশোধ আল্লাহ তা'আলা না নিয়ে ছাড়বেন না। প্রথম প্রকার যুলুম হচ্ছে শির্ক, দ্বিতীয় প্রকার আল্লাহর হকে ক্রটি করা এবং তৃতীয় প্রকার বান্দার হক বিনষ্ট করা। [ইবন কাসীর] এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, তিনি তাঁর সাথে শির্ক করাকে ক্ষমা করবেন না। এর বাইরে যত গোনাহ আছে সবই তিনি যার জন্যে ইচ্ছে ক্ষমা করে দিবেন। আর যে তাঁর সাথে কাউকে শরীক করে সে অবশ্যই এক বড় মিথ্যা অপবাদ রটনা করল। (তাফসির আবু বকর জাকারিয়া)

*মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন-

ذَٰلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۚ وَلَوْ أَشْرَكُوا۟ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ٨٨

>> যদি তাঁরা (নবী রাসূলগণ) শিরক করতেন তবে অবশ্যই তাদের সমস্ত নেক আমল বরবাদ হয়ে যেত।' (সুরা আনআ'ম : আয়াত ৮৮)

আলোচ্য আয়াতসমূহে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত দানসমূহ বর্ণনা করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসের একটি নিয়ম ব্যক্ত করা হয়েছে যে,"যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে প্রিয় বস্তু বিসর্জন দেয়, আল্লাহ তা'আলা তাকে দুনিয়াতেও তদপেক্ষা উত্তম বস্তু দান করেন।" [মুসনাদে আহমাদ ৫/৩৬৩] অপরদিকে মক্কার মুশরিকদেরকে এসব অবস্থা শুনিয়ে বলা হয়েছে যে, দেখ, তোমাদের মান্যবর ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও তার সমগ্র পরিবার এ কথাই বলে এসেছেন যে, আরাধনার যোগ্য একমাত্র সত্তা হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলা। তার সাথে অন্যকে আরাধনায় শরীক করা কিংবা তার বিশেষ গুণে তার সমতুল্য মনে করা, তার ইবাদাতে অপর কাউকে শরীক করা শির্ক, কুফর ও পথভ্রষ্টতা। অতএব, তোমরা যদি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশ অমান্য কর, তবে তোমরা আপন স্বীকৃত বিষয় অনুযায়ীও অভিযুক্ত। (তাফসির আবু বকর জাকারিয়া)

*মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন-

وَلَقَدْ أُوحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَـٰسِرِينَ

>> (হে নবি!) আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি ওহি করা হয়েছে যে, যদি আল্লাহর সঙ্গে অংশীদার স্থাপন করেন, তাহলে আপনার সব আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।' (সুরা যুমার : আয়াত ৬৫)

*মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন-

لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ ۖ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَـٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ رَبِّى وَرَبَّكُمْ ۖ إِنَّهُۥ مَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَىٰهُ ٱلنَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّـٰلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ٧٢

>> তারা নিঃসন্দেহে অবিশ্বাসী (কাফের), যারা বলে,ও মরিয়মের ছেলে মসিহ-ই আল্লাহ। অথচ মসিহ বলেছিল,ও হে বনি ইসরাইল! তোমরা আমার এবং তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর উপাসনা কর। অবশ্যই যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে কাউকে অংশীদার স্থাপন করে, আল্লাহ তার ওপর জান্নাত হারাম করে দেন। তার পরিণতি হবে জাহান্নাম। এ সব জালিমদের কেউই সাহায্যকারী নেই। (সুরা মায়িদা : আয়াত ৭২)

এর পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বনী ইসরাঈলের ঔদ্ধত্য ও তাদের অত্যাচার-উৎপীড়ন বর্ণনা করা হয়েছিল যে, আল্লাহ প্রেরিত রাসূল- যারা তাদের অক্ষয় জীবনের বার্তা এবং তাদের দুনিয়া ও আখেরাত সংশোধনের কার্যবিধি নিয়ে আগমন করেছিলেন, তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের পরিবর্তে তারা তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করে। কতক নবীকে তারা মিথ্যারোপ করে এবং কতককে হত্যা করে ফেলে। আলোচ্য আয়াতে বনী ইসরাঈলের কুটিলতার আরেকটি দিক উল্লেখ করা হয়েছে যে, মূর্খরা যেমন ঔদ্ধত্য ও অবাধ্যতার এক প্রান্তে থেকে আল্লাহর নবীদের প্রতি মিথ্যারোপ করেছে এবং কতককে হত্যা করেছে, তেমনি এরাই বক্রতার অপর প্রান্তে পৌঁছে নবীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে বাড়াবাড়ি করে তাদেরকে আল্লাহ্‌তে পরিণত করে দিয়েছে। তারা বলে,ও নিশ্চয় আল্লাহ্ তিনি তো মারইয়াম তনয় মসীহ' এ কথা বলে তারা কুফরী করল এবং কাফের হয়ে গেল। ইতিহাস বলে যে, যারা এ ধরণের উক্তি করত তারা হচ্ছে, নাসারাদের মালেকিয়্যা, ইয়া'কুবিয়্যা এবং নাসতুরিয়্যাহ সম্প্রদায়। [ইবন কাসীর] আলোচ্য আয়াতে যদিও এ উক্তিটি শুধু নাসারাদের বলে বর্ণিত হয়েছে। অন্যত্র এ ধরণের বাড়াবাড়ি ও পথভ্রষ্টতা ইয়াহুদী এবং নাসারা উভয়ের ব্যাপারেও বর্ণনা করা হয়েছে,

(وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُ ابْنُ اللهِ وَقَالَتِ النَّصٰرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللهِ ۗ ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ ۚ يُضَاهِـــُٔوْنَ قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ۗ قٰتَلَهُمُ اللهُ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ)

অর্থাৎ "আর ইয়াহুদীরা বলে,ও উযায়র আল্লাহর পুত্র', এবং খৃস্টানরা বলে,ও মসীহ আল্লাহর পুত্র।' এটা তাদের মুখের কথা। আগে যারা কুফরী করেছিল ওরা তাদের মত কথা বলে। আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন। কোন্ দিকে তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে?চ [সূরা আত-তাওবাহ ৩০] (তাফসির আবু বকর জাকারিয়া)

আল্লাহ্ তা’আলা ভিন্ন অন্য কাউকে ডাকা হলেও তারা কখনো কারোর ডাকে সাড়া দিবেনা। বরং তাদেরকে ডাকা সর্বদা ব্যর্থ ও নিষ্ফল হতে বাধ্য।

*আল্লাহ ঘোষণা করেন-

لَهُۥ دَعۡوَةُ ٱلۡحَقِّۖ وَٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ مِن دُونِهِۦ لَا يَسۡتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيۡءٍ إِلَّا كَبَٰسِطِ كَفَّيۡهِ إِلَى ٱلۡمَآءِ لِيَبۡلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَٰلِغِهِۦۚ وَمَا دُعَآءُ ٱلۡكَٰفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَٰلٖ ١٤

সত্যের আহ্বান তাঁরই। যারা তাঁকে ছাড়া অন্যকে আহ্বান করে, তারা তাদেরকে কোনো কিছুতেই সাড়া দেয় না; তাদের দৃষ্টান্ত সে ব্যক্তির মত, যে তার মুখে পানি পৌঁছবে এ আশায় তার দুহাত মেলে ধরে পানির দিকে, অথচ তা তার মুখে পৌঁছার নয়, আর কাফিরদের আহ্বান তো কেবল ভ্রষ্টতায় নিপতিত

সুরা আর রাদ আয়াত ১৪

ডাকা মানে নিজের অভাব পূরণের উদ্দেশ্যে সাহায্যের জন্য ডাকা। এর মানে হচ্ছে, অভাব ও প্রয়োজন পূর্ণ এবং সংকটমুক্ত করার সব ক্ষমতা একমাত্র তাঁর হাতেই কেন্দ্রীভূত। তাই একমাত্র তাঁর কাছেই প্রার্থনা করা সঠিক ও যথার্থ সত্য বলে বিবেচিত। তাঁর আহ্বানই হক্ক আহ্বান। সে আহ্বানের মূল হচ্ছে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’। তিনি আল্লাহ্ ব্যতীত হক্ক কোনো মা’বুদ নেই। (دَعْوَةُ الْحَقِّ) শব্দের তাফসীরে ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে এটাই বর্ণিত আছে।

(তাফসিরে তাবারি)

যারা একমাত্র আল্লাহ্ তা’আলা ছাড়া অন্য কাউকে ডাকে তাদেরকে আল্লাহ্ তা’আলা ভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত বলে আখ্যায়িত করেছেন।

*মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন-

وَمَنۡ أَضَلُّ مِمَّن يَدۡعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسۡتَجِيبُ لَهُۥٓ إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَهُمۡ عَن دُعَآئِهِمۡ غَٰفِلُونَ ٥

আর সে ব্যক্তির চেয়ে বেশী বিভ্রান্ত কে যে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা কিয়ামতের দিন পর্যন্ত তাকে সাড়া দেবে না? এবং এগুলো তাদের আহ্বান সম্বন্ধেও গাফেল। (সুরা আল আহকাফ, ৫)

মহান আল্লাহ স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলেনঃ এই মুশরীকদেরকে তুমি জিজ্ঞেস কর- তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাকো এবং যাদের ইবাদত কর, তাদের কথা কিছু ভেবে দেখেছো কি? তারা পৃথিবীতে কি সৃষ্টি করেছে আমাকে দেখাও তো? অথবা আকাশমণ্ডলীতে তাদের কোন অংশীদারিত্ব আছে কি? প্রকৃত ব্যাপার তো এই যে, আকাশ হোক, পৃথিবী হোক, যে কোন জিনিসই হোক না কেন সবকিছুরই সৃষ্টিকর্তা একমাত্র

আল্লাহ। তিনি ছাড়া কারো এক অণুপরিমাণ জিনিসেরও অধিকার নেই। সমগ্র রাজ্যের মালিক তিনিই। প্রত্যেক জিনিসের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান একমাত্র তিনি। তিনিই সবকিছুর ব্যবস্থাপক। সবকিছুরই উপর পূর্ণ অধিকার একমাত্র তিনিই রাখেন। সুতরাং মানুষ তাঁর ছাড়া অন্যদের ইবাদত কেন করে? কেন তারা তাদের বিপদ-আপদের সময় অল্লাহ ছাড়া অন্যকে ডাকে? কে তাদেরকে এ শিক্ষা দিয়েছে? কে তাদেরকে এ শিরক করতে শিখিয়েছে? প্রকতপক্ষে কোন সৎ ও জ্ঞানী মানুষের এ শিক্ষা হতে পারে না।

মহান আল্লাহ তাদেরকে এ শিক্ষা দেননি। তাই তো তিনি বলেনঃ "পূর্ববর্তী কোন কিতাব অথবা পরম্পরাগত কোন জ্ঞান থাকলে তা আমার নিকট উপস্থিত কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।' কিন্তু আসলে তো এটা তোমাদের বাজে ও বাতিল কাজ। সুতরাং তোমরা এর স্বপক্ষে না পারবে কোন শরীয়ত সম্মত দলীল পেশ করতে এবং না পারবে কোন জ্ঞান সম্মত দলীল পেশ করতে। এক কিরআতে وَاَثَرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ রয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের পূর্ববর্তীদের হতে কোন সঠিক জ্ঞানের বর্ণনা পেশ কর।

মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ এমন কাউকেও উপস্থিত কর যে সঠিক ইলমের বর্ণনা দিতে পারে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ভাবার্থ হচ্ছেঃ এই বিষয়ের কোন দলীল আনয়ন কর।

মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জ্ঞান-লিপি। বর্ণনাকারী বলেন যে, তাঁর ধারণামতে এ হাদীসটি মার'। হযরত আবু বকর ইবনে আইয়াশ (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা বাকী ইলমকে বুঝানো হয়েছে। হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ 'কোন গোপন দলীলও পেশ কর?' এই সব গুরুজন হতে এটাও বর্ণিত আছে যে, এর দ্বারা পূর্ববতী লিপি উদ্দেশ্য। হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা কোন বিশেষ জ্ঞানকে বুঝানো হয়েছে। এসব উক্তি প্রায় একই অর্থবোধক। ভাবার্থ ওটাই যা আমরা প্রথমে বর্ণনা করেছি। ইমাম ইবনে জারীরও (রঃ) এটাকেই পছন্দ করেছেন।

এরপর ইরশাদ হচ্ছেঃ "ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত কে যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা কিয়ামত দিবস পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দিবে না? এবং এগুলো তাদের প্রার্থনা সম্বন্ধে অবহিতও নয়। কেননা এগুলো তো পাথর এবং জড় পদার্থ। এরা না শুনতে পায়, না দেখতে পায়।

কিয়ামতের দিন যখন সব মানুষকে একত্রিত করা হবে তখন এসব বাতিল মা'বুদ বা উপাস্য তাদের উপাসকদের শত্রু হয়ে যাবে এবং তারা এদের ইবাদত অস্বীকার করবে।

যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেনঃ

وَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللهِ اٰلِهَةً لِّيَكُوْنُوْا لَهُمْ عِزًّا - كَلَّا سَيَكْفُرُوْنَ بِعِبَادَتِهِمْ وَ يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا

অর্থাৎ "তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য মাবুদ গ্রহণ করে এ জন্যে যে, যাতে তারা তাদের সহায় হয়। কখনই নয়; তারা তাদের ইবাদত অস্বীকার করবে এবং তাদের বিরোধী হয়ে যাবে।"(১৯:৮১-৮২) অর্থাৎ যখন এরা তাদের পূর্ণ মুখাপেক্ষী হবে তখন তারা মুখ ফিরিয়ে নিবে।

হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (সঃ) তাঁর উম্মতকে বলেছিলেনঃ

اِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللهِ اَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَّ يَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَّ مَاْوٰىكُمُ النَّارُ وَ مَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ

অর্থাৎ "তোমরা আল্লাহ ব্যতীত প্রতিমাগুলোর সাথে যে পার্থিব সম্পর্ক স্থাপন করেছো এর ফলাফল তোমরা কিয়ামতের দিন দেখে নিবে, যখন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং একে অপরকে লা'নত করবে, আর তোমাদের আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম এবং তোমাদের জন্যে কোন সাহায্যকারী হবে না।"(আল কুরআন)

(তাফসিরে ইবনে কাসির)

একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই সকল লাভ-ক্ষতির মালিক। অন্য কেউ নয়। তিনি ইচ্ছে না করলে কেউ কারোর লাভ বা ক্ষতি করতে পারেনা। আর সকল কল্যাণাকল্যাণও কিন্তু মানব সাধ্যের আওতাধীন নয়। বরং তার অনেকটুকুই মানব সাধ্যাতীত। সুতরাং সকল ব্যাপারে তাঁকেই ডাকতে হবে

*মহান আল্লাহ বলেন-

وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۖ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّـٰلِمِينَ ١٠٦ وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهِۦ ۚ يُصِيبُ بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٧

আর আপনি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকবেন না, যা আপনার উপকারও করে না, অপকারও করে না, কারণ এটা করলে তখন আপনি অবশ্যই যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। আল্লাহ যদি তোমাকে কষ্ট দিতে চান তাহলে তিনি ছাড়া তা দূর করার কেউ নেই, আর আল্লাহ যদি তোমার কল্যাণ করতে চান, তাহলে তাঁর অনুগ্রহ রদ করার কেউ নেই। তিনি তাঁর বান্দাহদের মধ্যে যাকে চান অনুগ্রহ দিয়ে ধন্য করেন। তিনি বড়ই ক্ষমাশীল, বড়ই দয়ালু। (সুরা ইউনুস ১০৬,১০৭)

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল মুহাম্মাদ (সঃ)-কে বলেনঃ তুমি বলে দাও-- হে লোক সকল! আমি যে দ্বীনে হানীফ (একনিষ্ঠ ধর্ম) নিয়ে এসেছি, যার অহী আমার উপর অবতীর্ণ হয়েছে, যদি এর সঠিকতা ও সত্যতার ব্যাপারে তোমাদের সন্দেহ হয়ে থাকে তবে জেনে রেখো যে, আমি তোমাদের

উপাস্যদের কখনো উপাসনা করবো না। আমি এক ও অংশীবিহীন আল্লাহরই বান্দা, যিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটিয়ে থাকেন এবং যিনি তোমাদের জীবন দান করেছেন। নিঃসন্দেহে তোমাদের সকলকেই তারই নিকট ফিরে যেতে হবে। আচ্ছা, যদি ধরে নেয়া হয় যে, তোমাদের মা'বূদ সত্য, তবে তাদেরকে আমার কোন ক্ষতি করতে বলতো? জেনে রেখো যে, তাদের কারো লাভ বা ক্ষতি করার কোনই ক্ষমতা নেই। লাভ ও ক্ষতি করার হাত তো শরীকবিহীন আল্লাহর। হে নবী (সঃ)! তুমি কাফিরদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সম্পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর ইবাদতে লেগে যাও। শিরকের দিকে একটুও ঝুঁকে পড়ো না। যদি আল্লাহ তোমাকে ক্ষতির মধ্যে পরিবেষ্টন করেন, তবে কে এমন আছে যে, তোমাকে তা থেকে বের করতে পারে? লাভ ও ক্ষতি, কল্যাণ ও অকল্যাণ তো তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। (তাফসিরে ইবনে কাসির)

*মহান আল্লাহ বলেন-

قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِۖ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَلَا فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُۥ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ ٢٢ وَلَا تَنفَعُ ٱلشَّفَـٰعَةُ عِندَهُۥٓ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُۥ ۚ حَتَّىٰٓ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُواْ ٱلْحَقَّ ۖ وَهُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْكَبِيرُ ٢٣

বলুন, 'তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া যাদেরকে ইলাহ্ মনে করতে তাদেরকে ডাক। তারা আসমানসমূহে অণু পরিমাণ কিছুরও মালিক নয়, যমীনেও নয়। আর এ দু'টিতে তাদের কোনো অংশও নেই এবং তাদের মধ্য থেকে কেউ তাঁর সহায়কও নয় (২২)আর আল্লাহ যাকে অনুমতি দেবেন, সে ছাড়া তাঁর কাছে কারো সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না। অবশেষে যখন তাদের অন্তর থেকে ভয় বিদূরিত হয়, তখন তারা পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করে, 'তোমাদের রব কী বললেন?' তার উত্তরে তারা বলে, যা সত্য তিনি তা-ই বলেছেন আর তিনি সমুচ্চ, মহান।(২৩)

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বর্ণনা করছেন যে, তিনি এক ও একক। তিনি অমুখাপেক্ষী ও অভাবমুক্ত। তিনি ছাড়া কোনই মা'বুদ নেই। তিনি তুলনাবিহীন ও অংশীবিহীন। তাঁর কোন শরীক নেই, সাথী নেই, পরামর্শদাতা নেই, মন্ত্রী নেই এবং পরিচালক নেই। সুতরাং কে তাঁর সামনে হঠকারিতা করবে এবং তার বিরুদ্ধাচরণ করবে? তাই মহান আল্লাহ বলেনঃ যাদের কাছে তোমরা আবেদন করে থাকো, জেনে রেখো যে, অণু পরিমাণও ক্ষমতা তাদের নেই। তারা শক্তিহীন ও অক্ষম। না দুনিয়ায় তাদের কোন ক্ষমতা চলে, না আখিরাতে। যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ

وَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ

অর্থাৎ যাদেরকে তারা আল্লাহ ছাড়া ডাকে তারা খেজুরের ছালেরও মালিকানা রাখে না।"(৩৫:১৩) তাদের সার্বভৌম ক্ষমতা নেই এবং মালিকানার ভিত্তিতে কোন রাজত্ব নেই। আল্লাহ তা'আলা তাঁর কাজে তাদের কাছে কোনই সাহায্য গ্রহণ করেন না। অথচ তারা সবাই দরিদ্র, ফকীর ও অন্যের

মুখাপেক্ষী। তারা সবাই গোলাম ও বান্দা। তার শ্রেষ্ঠত্ব, বড়ত্ব, ইজ্জত ও মর্যাদা এমনই যে, তার অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে কেউ কারো জন্যে সুপারিশ করার সাহস রাখে। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ

مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ

অর্থাৎ "কে সে, যে তার অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করবে? (২:২৫৫) আর এক জায়গায় বলেনঃ

وَ كَمْ مِّنْ مَّلَكٍ فِى السَّمٰوٰتِ لَا تُغْنِىْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْـًٔـا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اَنْ يَّاْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ يَرْضٰى

অর্থাৎ "আকাশের বহু ফেরেশতাও কারো সুপারিশের জন্যে মুখ খুলতে পারে না। হ্যাঁ, তবে আল্লাহ স্বীয় সম্মতিক্রমে যার জন্যে অনুমতি দিবেন (তার জন্যে অরে)।"(৫৩:২৬) আর এক জায়গায় রয়েছেঃ

وَ لَا يَشْفَعُوْنَ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى وَ هُمْ مِّنْ خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ

অর্থাৎ তারা শুধু তারই জন্যে সুপারিশ করতে পারে যার প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট রয়েছেন এবং তারা তাঁর ভয়ে কম্পমান থাকে।"(২১:২৮)

যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, সমস্ত আদম-সন্তানের নেতা ও সবচেয়ে বড় সুপারিশকারী হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) কিয়ামতের দিন যখন মাকামে মাহমূদে শাফাআতের জন্যে উপস্থিত হবেন এবং সবাই ফায়সালার জন্যে তাদের প্রতিপালকের নিকট আসবে, ঐ সময়ের কথা রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, আমি আল্লাহ তা'আলার সামনে সিজদায় পড়ে যাবো। কতক্ষণ যে আমি জিদায় পড়ে থাকবো তা একমাত্র আল্লাহ তাআলাই জানেন। ঐ সিজদায় আমি আল্লাহ তা'আলার এতো প্রশংসা করবো যে, ঐ শব্দগুলো এখন আমার মনে হচ্ছে না। তখন আল্লাহ বলবেনঃ "হে মুহাম্মাদ (সঃ)! মাথা উঠাও এবং কথা বল, তোমার কথা শোনা হবে। তুমি চাও, তোমাকে দেয়া হবে। তুমি শাফাআত কর, কবূল করা হবে।" প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্বের আর একটি বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, যখন তিনি স্বীয় অহীর মাধ্যমে কথা বলেন, আর আকাশসমূহে আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী। ফেরেশতারা তা শুনে থাকেন, তখন তাঁরা ভয়ে কেঁপে ওঠেন এবং তাদের জ্ঞান লোপ পাওয়ার উপক্রম হয়। পরে যখন তাদের অন্তর হতে ভয় বিদূরিত হয় فُزِّعَ শব্দটি কোন কোন পঠনে فُرِّغَ ও এসেছে, দুটোরই ভাবার্থ একই। তখন তাঁরা একে অপরকে জিজ্ঞেস করেনঃ "এই সময় প্রতিপালকের কি হুকুম নাযিল হলো?" আহলে আরশ তাদের পার্শ্ববর্তীদের নিকট ধারাবাহিকভাবে ও সঠিকভাবে আল্লাহর আদেশ পৌছিয়ে থাকেন। এই আয়াতের একটি ভাবার্থ এও বর্ণনা করা হয়েছে যে, যখন মৃত্যু-যাতনার সময় আসে তখন মুশরিক একথা বলে থাকে এবং অনুরূপভাবে কিয়ামতের দিনও বলবে যখন তাদের জ্ঞান ফিরবে তাদের দুনিয়ার গাফিলতির পর, অর্থাৎ দুনিয়ায় যে তারা আল্লাহকে, তাঁর রাসূল (সঃ)-কে, আখিরাতকে ইত্যাদি সবকিছুকেই ভুলে ছিল, কিয়ামতের দিন যখন তাদের জ্ঞান ফিরবে এবং সব কিছু বুঝতে পারবে তখন তারা পরস্পর বলাবলি করবেঃ "তোমাদের প্রতিপালক কি বললেন?" উত্তরে বলা হবেঃ "যা সত্য তিনি তাই বলেছেন।" যে জিনিস হতে তারা দুনিয়ায় নিশ্চিন্ত থাকতো আজ সেটা তাদের সামনে পেশ করা হবে। তাহলে অন্তর হতে ভয় দূর হওয়ার অর্থ এই হলো যে, যখন তাদের চোখের উপর হতে

পর্দা সরিয়ে দেয়া হবে তখন তাদের পূর্বের সব সন্দেহ ও অবিশ্বাস মিটে যাবে এবং শয়তানী কুমন্ত্রণা দূর হয়ে যাবে, ঐ সময় তারা আল্লাহ তা'আলার সমস্ত কথার সত্যতা স্বীকার করে নিবে এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্মের কথা মেনে নিবে। সুতরাং মৃত্যুর সময়ের স্বীকারুক্তিও কোন কাজে আসবে না এবং কিয়ামতের দিনের স্বীকারুক্তিতেও কোন লাভ হবে না। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ)-এর মতে প্রথম তাফসীরই সঠিক। অর্থাৎ এটা ফেরেশতাদের উক্তি হওয়াই যুক্তিযুক্ত। হাদীসে ও আসারেও এর উপরই জোর দেয়া হয়েছে। সহীহ বুখারীতে এ আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যখন আল্লাহ তাআলা কোন বিষয়ের ফায়সালা আসমানে করেন তখন ফেরেশতারা বিনয়ের সাথে তাদের ডানা ঝুঁকিয়ে থাকেন এবং প্রতিপালকের কালাম এমনই হয় যেমন ঐ শিকলের শব্দ, যা পাথরের উপর বাজানো হয়। যখন তাদের ভয় কমে আসে তখন তারা পরস্পরের মধ্যে বিজ্ঞাসাবাদ করেনঃ “তোমাদের প্রতিপালক কি বললেন?" উত্তরে বলা হয়ঃ “যা সত্য তিনি তাই বলেছেন। তিনি সমুচ্চ, মহান।"

কোন কোন সময় জ্বিনেরা ফেরেশতাদের কথা শুনার জন্যে তাদের নির্ধারিত স্থানে গমন করে এবং চুরি করে কিছু শুনেও ফেলে। তাদের যারা উপরে থাকে তারা তাদের নীচে অবস্থানকারীদেরকে তা বলে দেয়। এভাবে ঐ কথাগুলো দুনিয়ায় চলে আসে এবং গণক ও যাদুকরদের কানে পৌঁছে যায়। ঐ শয়তান জ্বিনদেরকে জ্বালিয়ে দেয়ার জন্যে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। কিন্তু তার পূর্বেই কিছু কিছু খবর তারা দুনিয়ায় পৌঁছিয়ে দেয়। কখনো কখনো আবার খবর পৌঁছানোর পূর্বেই তারা জ্বলে পুড়ে যায়।

গণক বা যাদুকর দু' একটি ঐ সত্য কথার সাথে শত শতটি মিথ্যা মিলিয়ে জনগণের সামনে প্রচার করে। কাহেনের দু' একটি কথা যখন সত্য প্রমাণিত হয় তখন জনগণ তার মুরীদ হতে শুরু করে। তারা একে অপরকে বলেঃ “দেখো, এ কাজটি তার কথা অনুযায়ী হয়েছে।”

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীদের দলে বসেছিলেন। এমন সময় একটি তারকা খসে পড়লো, ফলে চতুর্দিক আলোকিত হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেনঃ “অজ্ঞতার যুগে এভাবে তারকা ছিটকে পড়লে তোমরা কি বলতে?” সাহাবীরা জবাবে বললেনঃ “এ অবস্থায় আমরা বলতাম যে, হয়তো কোন বড় ও সম্ভ্রান্ত মানুষ জন্মগ্রহণ করেছে অথবা মারা গেছে। বর্ণনাকারী যুহরী (রঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলোঃ অজ্ঞতার যুগেও কি এই ভাবে তারকা ঝরে বা ছিটকে পড়তো?” তিনি উত্তরে বলেনঃ “হ্যা, তবে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নবুওয়াতের যুগেই এটা খুব বেশী হয়।” রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীদের ঐ কথার উত্তরে বললেনঃ “জেনে রেখো যে, কারো জন্ম বা মৃত্যুর সাথে ওগুলোর কোন সম্পর্কে নেই। কথা হলো এই যে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা যখন আকাশে কোন বিষয়ের ফায়সালা করেন তখন আরশ বহনকারী ফেরেশতারা তাঁর তাসবীহ পাঠ করতে থাকেন। তারপর সপ্তম আকাশবাসী, এরপর ষষ্ঠ আকাশবাসী তাঁর মহিমা ঘঘাষণা করতে থাকেন। আর এভাবে শেষ পর্যন্ত এই তাসবীহ্ দুনিয়ার আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তারপর আরশের আশে পাশের ফেরেশতারা আরশ বহনকারী ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞেস করেনঃ “আল্লাহ তা'আলা কি বললেন?” তারা তখন তাঁদেরকে তা বলে দেন। এভাবে প্রত্যেক নীচের ফেরেশতা তাদের উপরের ফেরেশতাদেরকে এটা জিজ্ঞেস করেন এবং তাঁদেরকে তা বলে দেন। শেষ পর্যন্ত প্রথম আকাশে এ খবর পৌছে যায়। কখনো কখনো চুরি করে শ্রবণকারী জ্বিনেরা ওটা শুনে নেয়। তখন তাদের

উপর তারকা ছিটকে পড়ে। এতদসত্ত্বেও যে কথা পৌঁছানোর ইচ্ছা আল্লাহ তাআলা করেন, ওটা ঐ জ্বিন নিয়ে নেয় এবং ওর সাথে কহু কিছু মিথ্যা মিলিয়ে নিয়ে জনগণের মধ্যে প্রচার করে।" (এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন)

হযরত নাওয়াস ইবনে সামআন (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যখন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা কোন বিষয়ের অহী করার ইচ্ছা করেন তখন তিনি অহীর মাধ্যমে কথা বলেন। সুতরাং যখন তিনি কথা বলেন তখন আকাশ ভয়ে কাপতে শুরু করে। আর ফেরেশতারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে সিজদায় পড়ে যান। সর্বপ্রথম হযরত জিবরাঈল (আঃ) মাথা উঠান এবং আল্লাহর আদেশ শ্রবণ করেন। অতঃপর তার মুখে অন্যান্য ফেরেশতারা শুনেন এবং বলতে থাকেন যে, আল্লাহ সত্য বলেছেন। তিনি উচ্চতা ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। তিনি সমুচ্চ ও মহান।" (এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও হযরত কাতাদা (রঃ) এ আয়াতের তাফসীরে বলেন যে, এটা হলো ঐ অহী যা হযরত ঈসা (আঃ)-এর পরে নবী-শূন্য যামানায় বন্ধ থাকে। অতঃপর খাতিমুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর উপর নতুনভাবে নাযিল হওয়া শুরু হয়। প্রকৃত কথা এই যে, এই ইবতিদা বা নতুনভাবে শুরু হওয়াটাও এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। তবে আয়াতটি এটাকেও অন্তর্ভুক্ত করে এবং অন্য সবকেও করে।

(তাফসিরে ইবনে কাসির)

সুতরাং দুনিয়া ও পরকালের সফলতা শিরকমুক্ত ঈমান ছাড়া সম্ভব নয়। কারণ এ শিরক সম্পাদনকারী সম্পূর্ণরূপে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়। আর তা সরাসরি কুফরির নামান্তর। ফলে তার কোনো নেক আমল কাজে আসে না বরং সবই বিফলে যায়। তাই শিরকমুক্ত ঈমান লাভে তাওহিদের ওপর পরিপূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস অর্জনই ঈমানের একান্ত দাবি।

শিরক থেকে বাচার সুবিধার্থে সংক্ষেপে প্রচলিত কিছু বড় শিরকের উদাহরনঃ

>> আল্লাহ তাআলাকে না ডেকে অন্য কাউকে ইবাদতমূলক আহ্বান ও সেজদা করা।

>> আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্যের নামে পশু জবাই বা কুরবানি করা।

>> আল্লাহ ব্যতিত অন্য কাউকে দুনিয়া ও পরকালের সব কল্যাণ ও অকল্যাণের মালিক জানা।

>> কাউকে ভবিষ্যতের অজানা অমঙ্গল দূরকারী হিসেবে সাব্যস্ত করা।

>> আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সন্তান দানকারী হিসেবে মেনে নেয়া বা কারো কাছে সন্তান চাওয়া।

>> আল্লাহ ব্যতিত অন্য কাউকে ভাগ্য সুপ্রশস্তকারী হিসেবে সাব্যস্ত করা।

মূল কথা হচ্ছে-
যে সব ইবাদত ও ক্ষমতা আল্লাহ তাআলার জন্য খাস বা নির্ধারিত; সে সব বিষয়ে আল্লাহ তাআলাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে মুখ, অন্তর, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা বিশ্বাস ও সেজদা করাই হলো শিরকে আকবর বা বড় শিরক।

নিচে সূফীদের কিছু বানানো কাহিনী উল্লেখ করা হলোঃ

১. একদা হযরত আব্দুল কাদের জিলানী মুরগীর তরকারি খেয়ে হাড়গুলো পাশে রেখেছেন। অতঃপর হাড়গুলোর উপর হাত রেখে বললেনঃ আল্লাহ্'র আদেশে দাঁড়িয়ে যাও। ততক্ষণাতই মুরগীটি জীবিত হয়ে গেলো। (সীরাতে গাউস্, পৃষ্ঠাঃ ১৯১ শরীয়ত ও তরীক্বত, পৃষ্ঠাঃ ৪১১)

২. একদা হযরত আব্দুল কাদের জিলানী জনৈক গায়কের কবরে গিয়ে তাকে উদ্দেশ্য করে বলেনঃ আমার আদেশে দাঁড়িয়ে যাও। তখন কবর ফেটে লোকটি গাইতে গাইতে কবর থেকে বের হয়ে আসলো। (তাফরীজুল্ খা'ত্বির, পৃষ্ঠাঃ ১৯ শরীয়ত ও তরীক্বত, পৃষ্ঠাঃ ৪১২)

৩. হযরত খাজা আবু ইস্হাক্ব চিশ্তী যখনই সফর করতে চাইতেন তখনই দু' শত মানুষকে সাথে নিয়ে চোখ বন্ধ করলেই সাথে সাথে গন্তব্যস্থানে পৌঁছে যেতেন। (তা'রীখে মাশায়িখে চিশ্ত, পৃষ্ঠাঃ ১৯২ শরীয়ত ও তরীক্বত, পৃষ্ঠাঃ ৪১৮)

৪. সাইয়েদ মাওদূদ চিশ্তী ৯৭ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর প্রথম জানাযা মৃত বুযুর্গরা পড়েছেন। দ্বিতীয় জানাযা সাধারণ লোকেরা। অতঃপর জানাযাটি একা একা উড়তে থাকে। এ কারামত দেখে অগণিত মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। (তা'রীখে মাশায়িখে চিশ্ত, পৃষ্ঠাঃ ১৬০ শরীয়ত ও তরীক্বত, পৃষ্ঠাঃ ৭৪)

৫. খাজা 'উস্মান হারুনী দু' রাক'আত তাহিয়্যাতুল্ ওযু নামায পড়ে একটি ছোট বাচ্চাকে কোলে নিয়ে অগ্নিকুণ্ডে ঢুকে পড়লেন। উভয়ে দু' ঘন্টা পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। আগুন তাদের একটি পশমও জ্বালাতে পারেনি। তা দেখে অনেক অগ্নিপূজক মুসলমান হয়ে যায়। (তা'রীখে মাশায়িখে চিশ্ত, পৃষ্ঠাঃ ১২৪ শরীয়ত ও তরীক্বত, পৃষ্ঠাঃ ৩৭৫)

৬. জনৈকা মহিলা কাঁদতে কাঁদতে খাজা ফরীদুদ্দীন গাঞ্জে শুক্রের নিকট এসে বললোঃ রাষ্ট্রপতি আমার বেকসুর ছেলেকে ফাঁসি দিয়েছে। এ কথা শুনে তিনি নিজ সাথীদেরকে নিয়ে ওখানে পৌঁছে

বললেনঃ হে আল্লাহ্! যদি ছেলেটি বেকসুর হয়ে থাকে তাহলে আপনি তাকে জীবিত করে দিন। এ কথা বলার সাথে সাথেই ছেলেটি জীবিত হয়ে তাঁর সাথেই রওয়ানা করলো। তা দেখে এক হাজার হিন্দু মুসলমান হয়ে যায়। (আস্‌রারুল আউলিয়া, পৃষ্ঠাঃ ১১০-১১১ শরীয়ত ও তরীক্বত, পৃষ্ঠাঃ ৩৭৬)

৭. জনৈক ব্যক্তি হযরত আব্দুল কাদির জিলানীর দরবারে একজন ছেলে সন্তান ছেয়েছিলো। অতএব তিনি তাঁর জন্য দো'আ করেন। ঘটনাক্রমে লোকটির মেয়ে সন্তান জন্ম নেয়। অতএব তিনি লোকটিকে বললেনঃ তাকে ঘরে নিয়ে যাও এবং কুদরতের খেলা দেখো। যখন লোকটি ঘরে ফিরলো তখন মেয়েটি ছেলে হয়ে গেলো। (সাফীনাতুল্ আউলিয়া, পৃষ্ঠাঃ ১৭ শরীয়ত ও তরীক্বত, পৃষ্ঠাঃ ২৯৯)

৮. হযরত আব্দুল কাদির জিলানী মদীনা যিয়ারত শেষে খালি পায়ে বাগদাদ ফিরছিলেন। পথিমধ্যে তাঁর সাথে জনৈক চোরের সাক্ষাৎ হয়। লোকটি চুরি ছাড়তে চাচ্ছিলো। অতএব লোকটি গাউসে আ'জমকে চিনতে পেরে তাঁর পায়ে পড়ে বলতে শুরু করলোঃ হে আব্দুল কাদির! আমাকে বাঁচান। তিনি তার এ অবস্থা দেখে তার উপর দয়ার্দ্র হয়ে তার ইস্‌লাহের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে দো'আ করলেন। গায়েব থেকে আওয়াজ আসলো, তুমি চোরকে হিদায়াত করতে যাচ্ছো। তা হলে তুমি তাকে ক্বুতুব বানিয়ে দাও। অতএব চোরটি তাঁর এক দৃষ্টিতেই ক্বুতুব হয়ে গেলো। (সীরাতে গাউসিয়া, পৃষ্ঠাঃ ৬৪০ শরীয়ত ও তরীক্বত, পৃষ্ঠাঃ ১৭৩)

৯. মিয়া ইসমাঈল লাহোরী ফজরের নামাযের পর সালাম ফেরানোর সময় ডান দিকে দয়ার দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে সঙ্গে সঙ্গে ডান দিকের সকল মুসল্লী কোর'আন মাজীদের হাফিজ হয়ে যায় এবং বাম দিকের সকল মুসল্লী কোর'আন শরীফ দেখে দেখে পড়তে পারে। (হাদীক্বাতুল্ আউলিয়া, পৃষ্ঠাঃ ১৭৬ শরীয়ত ও তরীক্বত, পৃষ্ঠাঃ ৩০৪)

১০. খাজা আলাউদ্দীন সাবের কালীরিকে খাজা ফরীদুদ্দীন গাঞ্জে শুক্র "কালীর" পাঠিয়েছেন। এক দিন খাজা সাহেব ইমামের নামাযের জায়গায় বসে গেলেন। লোকেরা তাতে বাধা প্রদান করলে তিনি বললেনঃ ক্বুতুবের মর্যাদা কাজীর চাইতেও বেশি। অতঃপর সবাই তাঁকে জোর করে সেখান থেকে উঠিয়ে দিলে তিনি মসজিদে নামায পড়ার জন্য কোন জায়গা পাননি। তখন তিনি মসজিদকে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ সবাই সিজদাহ্ করছে। সুতরাং তুমিও সিজদাহ্ করো। সাথে সাথে মসজিদটি ছাদ ও দেয়াল সহ ভেঙ্গে পড়লো এবং সবাই মরে গেলো। (হাদীক্বাতুল্ আউলিয়া, পৃষ্ঠাঃ ৭০ শরীয়ত ও তরীক্বত, পৃষ্ঠাঃ ১৯৬)

১১. একদা কা'বা শরীফের প্রতিটি পাথর হযরত শায়েখ ইব্রাহীম মাত্‌বূলীর বড় শির্ক : কি ও কত প্রকার ৪১ চতুর্দিকে তাওয়াফ করে পুনরায় নিজ জায়গায় ফিরে আসে।

১২. হযরত ইব্রাহীম আল-আ'যাব সম্পর্কে বলা হয়, আগুনকে বেশি ভয় পায় এমন লোককে তিনি বলতেনঃ আগুনে ঢুকে পড়ো। এ কথা বলেই তিনি আগুনে প্রবেশ করে সেখানে দীর্ঘক্ষণ থাকতেন ;

অথচ তাঁর জামাকাপড় এতটুকুও পুড়তো না এবং তাঁর কোন ক্ষতিও হতো না। এমনিভাবে তিনি নির্ভয়ে সিংহের পিঠে চড়ে এ দিক ও দিক ঘুরে বেড়াতেন।

১৩. হযরত ইব্রাহীম আল-মাজ্যূব সম্পর্কে বলা হয়, তিনি কখনো কোন জিনিসের প্রয়োজন অনুভব করলেই তা পূরণ হয়ে যেতো। তাঁর জামাগুলো গলা কাটা থাকতো। গলাটি সঙ্কীর্ণ হলে সকল মানুষই খুব কষ্টে জীবন যাপন করতো। আর গলাটি প্রশস্ত হলে সকল মানুষই খুব আরাম অনুভব করতো।

১৪. হযরত ইব্রাহীম 'উস্বাইফীর সম্পর্কে বলা হয়, তিনি সাধারণত শহরের বাইরে গিয়ে নিচু ও গভীর জায়গায় ঘুমুতেন। বাঘের পিঠে চড়ে তিনি শহরে ঢুকতেন। পানির উপর দিয়ে তিনি হাঁটতেন। তাঁর নৌকার কোন প্রয়োজন ছিলো না।

১৫. হযরত ইব্রাহীম মাত্বূলী সম্পর্কে আরো বলা হয়, তিনি যখন কোন বাগানে ঢুকতেন তখন সেখানকার সকল গাছ ও উদ্ভিদগুলো নিজেদের সকল গুণাগুণ তাঁকে ডেকে ডেকে বলতো।

১৬. হযরত ইব্রাহীম মাত্বূলী সম্পর্কে আরো বলা হয়, তিনি কখনো মিসরে জোহরের নামায পড়তেন না। একদা জনৈক মুফতী সাহেব তাঁকে তিরস্কার করেন। অতঃপর তিনি ফিলিস্তিন সফর করে দেখেন, ইব্রাহীম মাত্বূলী রামাল্লাহ্'র সাদা মসজিদে জেহরের নামায আদায় করছেন। মসজিদের ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেনঃ এ তো সর্বদা এখানেই নামায পড়ে।

১৭. শায়েখ ইব্রাহীম 'উরয়ান সম্পর্কে বলা হয়, যখন তিনি কোন শহরে ঢুকতেন তখন সেখানকার ছোট-বড়ো সবাইকে তিনি তাদের নাম ধরে ডাকতেন। যেন তিনি এখনকার দীর্ঘ দিনের বাসিন্দা। অতঃপর তিনি মিম্বরে উঠে উলঙ্গ অবস্থায় খুতবা দিতেন।

১৮. হযরত শায়েখ আবু 'আলী সম্পর্কে বলা হয়, তিনি ছিলেন বহু রূপী। কখনো তাঁকে সৈন্য রূপে দেখা যেতো। আবার কখনো নেকড়ে বাঘ রূপে। কখনো হাতী রূপে। আবার কখনো ছোট ছেলের রূপে। তিনি মানুষকে মুষ্ঠি ভরে মাটি দিলে তা স্বর্ণ বা রুপা হয়ে যেতো।

১৯. হযরত ইউসুফ আজ্মী সম্পর্কে বলা হয়, একদা হঠাৎ তাঁর চোখ একটি কুকুরের উপর পড়ে গেলে সকল কুকুর তার পিছু নেয়। কুকুরটি হাঁটলে সেগুলোও হাঁটে। আর কুকুরটি থেমে গেলে সেগুলোও থেমে যায়। মানুষ এ ব্যাপারটি তাঁকে জানালে তিনি কুকুরটির নিকট খবর পাঠিয়ে বললেনঃ তুমি ধ্বংস হয়ে যাও। তখন সকল কুকুর কুকুরটিকে কামড়াতে শুরু করলো। অন্য দিন আরেকটি কুকুরের উপর তাঁর হঠাৎ দৃষ্টি পড়লে সকল কুকুর আবার তার পিছু নেয়। তখন মানুষ কুকুরটির নিকট গেলে তাদের সকল প্রয়োজন সমাধা হয়ে যেতো। কুকুরটি একদা রোগাক্রান্ত হলে সকল কুকুর একত্রিত হয়ে কাঁদতে শুরু করলো। তারা কুকুরটির জন্য আপসোস করতে লাগলো। একদা কুকুরটি মরে গেলে সকল কুকুর চিৎকার দিয়ে কাঁদতে লাগলো। আল্লাহ্ তা'আলার ইলহামে কিছু মানুষ

কুকুরটিকে দাপন করে দিলো। কুকুরগুলো যতোদিন বেঁচে ছিলো তারা উক্ত কুকুরটির যিয়ারত করতো।

২০. হযরত আবুল খায়ের মাগরিবী সম্পর্কে বলা হয়, তিনি একদা মদীনায় গেলেন। তিনি পাঁচ দিন যাবত কিছুই খাননি। নবী , হযরত আবু বকর ও 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমা) কে সালাম দিয়ে তিনি রাসূল কে আবদার করে বললেনঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল ! আমি আজ রাত আপনারই মেহমান। এ কথা বলে তিনি মিম্বরের পেছনে শুয়ে পড়লেন। স্বপ্নে দেখেন স্বয়ং রাসূল হযরত আবু বকর, 'উমর ও 'আলী কে নিয়ে তাঁর সামনেই উপস্থিত। হযরত আলী তাঁকে মৃদু ধাক্কা দিয়ে বললেনঃ উঠো, রাসূল এসেছেন। অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে রাসূল এর দু' চোখের মাঝে চুমু খেলেন। রাসূল তাঁকে একটি রুটি দিলেন। যার অর্ধেক তিনি স্বপ্নে খেয়েছেন। আর বাকি অর্ধেক ঘুম থেকে উঠে নিজের হাতেই দেখতে পেলেন।

২১. বায়েযীদ বোস্তামী সম্পর্কে বলা হয়, তিনি এক বছর যাবত ঘুমাননি এবং পানিও পান করেননি।
২২. শায়েখ মুহাম্মাদ আহ্‌মাদ ফারগালী সম্পর্কে শুনা যায়, একদা একটি কুমির মুখাইমির নাক্বীবের মেয়েকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। তখন সে কাঁদতে কাঁদতে তাঁর নিকট আসলে তিনি বললেনঃ যেখান থেকে তোমার মেয়েটিকে কুমির ছিনিয়ে নিলো সেখানে গিয়ে উচ্চ স্বরে ডাক দিয়ে বলবেঃ হে কুমির! ফারগালীর সাথে কথা বলে যাও। তখন কুমিরটি সাগর থেকে উঠে সোজা ফারগালীর বাড়িতে চলে আসলো। আর মানুষ তা দেখে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছিলো। তখন তিনি কামারকে বললেনঃ এর দাঁতগুলো উপড়ে ফেলো। তখন সে তাই করলো। অতঃপর তিনি কুমিরকে মেয়েটি উগলে দিতে বললেন। কিছুক্ষণের মধ্যে মেয়েটি জীবিতাবস্থায় কুমিরের পেট থেকে বের হয়ে আসলো। তখন তিনি কুমিরটিকে এ মর্মে অঙ্গিকার করালেন যে, যতোদিন সে বেঁচে থাকবে কাউকে আর এ এলাকা থেকে ছিনিয়ে নিবে না। তখন কুমিরটি কাঁদতে কাঁদতে সাগরের দিকে নেমে গেলো।

২৩. শায়েখ আব্দুর রহীম ক্বান্নাভী সম্পর্কে বলা হয়, একদা তাঁর বৈঠকে আকাশ থেকে একটি মূর্তি নেমে আসলো। কেউ চিনলো না মূর্তিটি কি ? ক্বান্নাভী সাহেব কিছুক্ষণ পর্যন্ত তাঁর মাথাটি নিচু করে রাখলেন। অতঃপর মূর্তিটি উঠে গেলো। লোকেরা এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেনঃ একজন ফিরিশ্‌তা দোষ করে বসলো। তাই সে আমার নিকট সুপারিশ কামনা করলো। আমি সুপারিশ করলে আল্লাহ্ তা'আলা তা কবুল করেন। অতঃপর ফিরিশ্‌তাটি চলে গেলো।

২৪. সাইয়েদ আহ্‌মাদ স্বাইয়াদী সম্পর্কে বলা হয়, তিনি যখনই নদীর পাড়ে যেতেন তখন নদীর মাছগুলো তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়তো। কোন মরুভূমি দিয়ে তিনি চলতে থাকলে সকল পশু তাঁর পায়ে গড়াগড়ি করতো। এমনকি তাঁর স্বাভাবিক চলার পথেও রাস্তার দু' পার্শ্বে পশুরা তাঁর সম্মানে দাঁড়িয়ে যেতো। তাঁর সম্পর্কে আরো বলা হয়, তিনি একটি সিজ্‌দায় পূর্ণ একটি বছর কাটিয়ে দিলো। একটি বারের জন্যও তিনি সিজ্‌দাহ্ থেকে মাথাটি উঠাননি। যার দরুন তাঁর পিঠে গাস জন্মে গেলো।

২৫. সাইয়েদ বাদাভী সম্পর্কে বলা হয়, তিনি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তিনটি দো'আ করেন। যার মধ্যে দু'টি দো'আ আল্লাহ্ তা'আলা কবুল করেছেন। আরেকটি দো'আ কবুল করেননি। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট এ মর্মে দো'আ করেছেন যে, কেউ যদি তাঁর কবর যিয়ারত করে তা হলে আল্লাহ্ তা'আলা যেন তার ব্যাপারে তাঁর পক্ষ থেকে যে কোন সুপারিশ কবুল করেন। আল্লাহ্ তা'আলা তা কবুল করলেন। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট এ মর্মেও দো'আ করেছেন যে, কেউ যদি তাঁর কবর যিয়ারত করে তা হলে আল্লাহ্ তা'আলা যেন তাকে একটি হজ্জ ও একটি 'উমরাহ্'র পূর্ণ সাওয়াব দেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাও কবুল করলেন। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট এ মর্মেও দো'আ করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা যেন তাঁকে জাহান্নামে প্রবেশ করান। আল্লাহ্ তা'আলা কিন্তু তা কবুল করলেন না। লোকেরা এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেনঃ আমি যদি জাহান্নামে ঢুকে গড়াগড়ি করি তা হলে জাহান্নাম সবুজ বাগানে পরিণত হবে। আর আল্লাহ্ তা'আলার তো এ অধিকার অবশ্যই রয়েছে যে, তিনি কাফিরদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে তাদের যথাযথ শাস্তির ব্যবস্থা করবেন।

(বড় শির্ক: কি ও কত প্রকার,
সম্পাদনায়ঃ মোস্তাফিজুর রহ্মান বিন্
আব্দুল আজিজ)

ছোট শিরক

শাদ্দাদ ইবন আওস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করল সে শির্ক করল। যে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে সিয়াম পালন করল সে শির্ক করল এবং যে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে দান-সদকা করল সে শির্ক করল।' [মুসনাদে ত্বায়ালেসী ১১২০, মুস্তাদরাকে হাকেম ৪/৩৬৫]

ছোট শির্কের সংজ্ঞাঃ শির্কে আকবর নয়, এমন যে সব কর্মকে শরীয়তের সুস্পষ্ট প্রমাণ দ্বারা শির্ক বলা হয়েছে, সেগুলোই হচ্ছে শির্কে আসগর বা ছোট শির্ক। একজন মানুষ তাওহীদবাদী হওয়া সত্বেও তার আমলের মাধ্যমে যখন এর ব্যতিক্রম কিছু পরিলক্ষিত হয় অর্থাৎ এক আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস রাখা সত্ত্বেও কাজে-কর্মের মাধ্যমে যখন কোন কিছুকে আল্লাহ তা'আলার সমকক্ষ করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়, তখন সেটা ছোট শির্ক হিসেবে গণ্য হবে।

'শির্ক কি ও কেন?' গ্রন্থের প্রণেতা ড. মুহাম্মদ মুয্যাম্মিল আলীর মতে ছোট শির্কের সংজ্ঞা হলোঃ "এমন সব কথা বা কাজ যদ্বারা বাহ্যিকভাবে গায়রৰলৰাহকে আলৰাহ্ তা'আলার সাথে সমান করে নেয়া হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়, যদিও এই সমান করাটি প্রকৃতপৰে কর্তা ব্যক্তির উদ্দেশ্য নয়।"

এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, ছোট শির্ক অনেকটা মানুষের শির্কী উদ্দেশ্য বহির্ভূত কর্ম, যা প্রকারান্তে শির্ক সংঘটিত করে। তবে শির্কে আসগর কখনও কর্তা ব্যাক্তির মানসিক অবস্থা, উদ্দেশ্যে এবং বিশ্বাসের স্তরের উপর ভিত্তি করে শির্কে আকবরেও রূপান্তরিত হতে পারে। আলৰাহ্র সমকক্ষ নির্ধারণ করা হয় এমন কোন কথা ও কাজ যখন কর্তা ব্যক্তির বিশ্বাস এবং উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে করা না হয়, তখন সেটা শিরকে আসগর বা ছোট শির্ক হিসেবে বিবেচিত হবে; কিন্তু ঐ একই কর্মটির সাথে যখন কর্তা ব্যক্তির বিশ্বাস এবং উদ্দেশ্য এ দু'য়ের সমন্বয় সাধিত হয় তখন সেটা শির্কে আকবর বা বড় শির্ক হিসেবে গণ্য হবে।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, তা'বীজের ব্যবহার স্বাভাবিকভাবে ছোট শিরকের অন্তর্গত কিন্তু তা প্রদানকারী ও ব্যবহারকারীর মানসিক অবস্থা ও উদ্দেশ্যের পরিপ্রেৰিতে বড় শির্কেও রূপান্তরিত হতে পারে। যদি কেউ মনে করে যে, আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা ব্যতীতই তা'বীজ মানুষের উপর নিজ থেকেই প্রভাব বিস্তার করে থাকে, তখন সেটা হবে বড় শির্ক। আর যদি সে মনে করে যে, আল্লাহর ইচ্ছাতেই তা'বীজ কাজ করে থাকে তখন সেটা হবে ছোট শির্ক। এভাবে জ্যেতিষী বা গণকের কাছে আনাগোনা করা এবং এদের কথায় বিশ্বাস করা ছোট শির্কের অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু কখনও কখনও তা বড় শির্ক হিসেবেও গণ্য হতে পারে যখন ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে এদের উপর নির্ভশীল থাকে এবং তাদেরকে নিজে থেকেই ইলমে গায়েবের হকদার বলে মনে করে। এ ছাড়াও অন্যন্য প্রকারর ছোট শির্কও কর্তার বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে বড় শির্কে রূপান্তরিত হতে পারে।

প্রত্যেক এমন সব বিষয় যা বড় শিরকের মাধ্যম কিংবা শরী'আতের দলীলে যে বিষয়গুলোকে শিরক হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে; কিন্তু সেগুলো বড় শিরকের গণ্ডিভুক্ত নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই শিরক দুই দিক থেকে সংঘটিত হয়ে থাকে।

(১) এমন কিছু উপায়-উপকরণের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার দিক থেকে আল্লাহ তা'আলা যে সব উপায়-উপকরণের অনুমতি দেননি। যেমন- হাতের কব্জি, পুতি বা এ ধরণের কিছু এ বিশ্বাস নিয়ে লটকানো যে, এগুলো সুরক্ষার উপকরণ কিংবা এগুলো বদনজরকে প্রতিহত করে। অথচ আল্লাহ তা'আলা এগুলোকে এসবের উপকরণ বানাননি; না শরী'আতের বিধান হিসাবে; আর না তাকদীরের নিয়ম হিসেবে।

(২) কিছু কিছু জিনিসকে এমন সম্মান প্রদর্শন করার দিক থেকে; তবে এমন সম্মান যেটা ঐ জিনিসকে রুবূবিয়্যতের পর্যায়ে পৌঁছায় না। যেমন আল্লাহ ছাড়া অন্যসত্তার নামে কসম করা কিংবা 'যদি আল্লাহ ও অমুক না হত' এভাবে বলা এবং এ ধরণের অন্যান্য কথা।

ছোট শির্কের ভয়াবহতা এবং শির্ককারীর পরিণতি

ছোট শির্ক হচ্ছে বড় শির্কের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম বিপজ্জনক। ছোট শির্ক সাধারণ কবিরা গুণাহের অন্তর্গত। শরিয়তের দৃষ্টিতে ছোট শির্ক এমন পর্যায়ের অপরাধ যে, কার্যত একজন মানুষ এ গুণাহে লিপ্ত থাকলে– সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায় না। তার অপরাধ সাধারণ কবীরা গুণাহের অন্তর্ভুক্ত তার বিষয়টি আল্লাহ্ তা'আলার এখতিয়ারে; এ অপরাধের জন্য আল্লাহ্ চাইলে তাকে শাস্তি দিতে পারেন অথবা ক্ষমাও করে দিতে পারেন। তার সংশিষ্ট নেক আমলটি বরবাদ হয়ে যায়।

আপাতঃদৃষ্টিতে ছোট শির্ককে লঘু অপরাধ বলে মনে হলেও এর বাস্তবতাকে খাটো করে দেখার কোন উপায় নেই। কেননা এটি একটি কবিরা গুণাহ এবং তা একজন মানুষের জন্য ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা না করলে এর জন্য তাকে আখিরাতে কঠিন সাজা ভোগ করতে হবে। আবার যখন কোন ব্যক্তি অব্যাহত ভাবে ছোট শির্কে লিপ্ত থাকে তখন তার ঈমান নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। এভাবে তার নেক আমলসমূহ বরবাদ হয়ে যেতে পারে এবং তা তার জন্য বয়ে আনতে পারে প্রভুত অকল্যান এবং আখিরাতের জাহান্নামের কঠিন শাস্তি। তাই ছোট শির্কের অপরাধকে লঘু মনে করে নির্বিকারে এবং অব্যহতভাবে এ গুণাহের সাথে লিপ্ত থাকার অবকাশ রয়েছে বলে ভাববার কোন সুযোগ নেই। পাপ করলেও শাস্তি ভোগ করতে হবেনা– এমনটি নিশ্চিত হয়ে পাপের কাজ চালিয়ে যাওয়া কোনো সুস্থ মানসিকতার পরিচয় নয়। বস্তুতঃ এ ভাবনায় বিভোর হয়ে যারা পাপের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে তারা নিতান্তই ৰতির মধ্যে অবস্থান করছে। পরকালীন কল্যাণের জন্য ছোট শির্ক সহ অন্যান্য সকল গুণাহ্ থেকে বেঁচে থাকা তাই সকলেরই ব্রত হওয়া বাঞ্ছণীয়।

ছোট শির্কের শাখা সমূহ

ছোট শির্কের অনেকগুলি শাখা রয়েছে। প্রধানতঃ ছোট শিরক্কে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথাঃ অপ্রকাশ্য বা গোপণ শির্ক এবং প্রকাশ্য শির্ক।

অপ্রকাশ্য ছোট শির্ক: অপ্রকাশ্য শির্ক বলতে এমন সব বিষয়কে বুঝান হচ্ছে যা চোখে দেখা যায় না অথবা কানে শোনা যায় না এমনকি তা অনুভব করাও দুস্কর। কর্তা ব্যক্তির অগোচরেই সংঘটিত হয় এ শির্ক। এ শির্কের প্রধান শাখা হচ্ছে রিয়া। এ ছাড়াও শির্কে খফীও এ শির্কের অন্তর্ভুক্ত।

রিয়াঃ ভাষাগতভাবে রিয়া এসেছে মূল শব্দ 'র'য়া' হতে- যার অর্থ দেখানো, অবলোকন করানো, দৃশ্যমান করা। পরিবর্তিত শব্দ যার অর্থ ভন্ডামি, কপটতা। শরিয়তের দৃষ্টিতে "রিয়া বলতে বুঝায় এমন কোন ইবাদত বা নেক আমল যা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করা হয়ছে বলে মনে হয় অথচ তা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে দেখানো বা অন্য কারো সন্তুষ্টি অর্জন করার নিয়্যতে করা হয়।" সংজ্ঞাদৃষ্টে বোঝা যায় যে, রিয়া সৃষ্টি হয় অন্তরে নিয়্যাতের মাধ্যমে। অন্তরের কাজটি হল ঈমানের ভিত্তি এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা দেহের কাজ হল এর অনুসরণ এবং বাস্তবায়ন। অন্তরের ইবাদাত দৈহিক ইবাদতের চেয়ে মহৎ। অন্ত রের নিয়্যত ছাড়া দেহের ইবাদত অর্থহীন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, নিয়্যত বা অন্ত রের অকাঙ্খাই হচ্ছে যে কোন কাজের মৌলিক বিষয় ও দ্বীনের ভিত্তি আর তাই এটাই রিয়া সংঘটনের উপাদান। রিয়া মূলত দ্বীনের কোন কাজ অর্থাৎ ইবাদত ও সওয়াবের লৰ্ে্য সম্পাদিত নেক আমলের সাথে সম্পৃক্ত; কিন্তু মুয়ামালাত অর্থাৎ স্রেফ দুনিয়াবী কাজের সাথে এটা সম্পর্কিত নয়। বিভিন্ন প্রকারের ইবাদতের যে কোনটির চর্চা লোকদেখানো বা লোকের প্রশংসা পাওয়ার উদ্দেশ্যে এবং কোন প্রকার যশ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি এবং আর্থিক সহ পার্থিব যে কোন প্রকার সুযোগ-সুবিধা আদায়ের লৰ্ে্য সম্পাদন করাই হচ্ছে রিয়া।

মানুষ স্বভাবতঃই সঙ্গী-সাথী বা অন্য লোকদের কাছ থেকে প্রশংসা পেতে আশা করে এবং পেলে আনন্দিত হয়। কেউ যদি অপ্রত্যাশিতভাবে কারো প্রশংসা পেয়ে যায় সেটা কোন দোষের কিছু নয়। কিন্তু কোনো ইবাদত ও নেক আমলের ৰেত্রে অন্য মানুষের প্রশংসা পাওয়ার আকাঙ্খা পোষণ করা দোষণীয়। কেননা ইবাদতের মূল শর্ত হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ্র সমীপে নিজেকে সমর্পন করা এবং কেবলমাত্র আল্লাহ তায়ালার রাজী-খুশীর জন্য নিজেকে নিবেদন করা। সেক্ষেত্রে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোনো মানুষকে দেখানো বা তাদের সন্তুষ্টি অর্জন করার প্রচেষ্টা করা রিয়ার অপরাধ সংঘটিত করে থাকে।

মোটকথা, যাতে মানুষকে খুশী করা যায় এবং মানুষের প্রশংসা কুঁড়ান যায় এমন নিয়্যতে সম্পাদিত লোকপ্রদর্শণীমূলক সকল ইবাদত বা নেক আমলই রিয়ার অন্তর্ভুক্ত। কোনো নেক আমল লুক্কায়িতভাবে করার পর মানুষের প্রশংসা পাওয়ার উদ্দেশ্যে তা কাউকে জানান বা বলে বেড়ানও এ শির্কের অন্তর্ভুক্ত। (শিরক – ড. মোঃ সেলিম রেজা)

জেহাদঃ মুসলিমদের জন্য জেহাদ একটি ফরয ইবাদত। জেহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলামকে সমুন্নতরাখার উদ্দেশ্যে ইসলাম বিরোধী শক্তিসমূহের বিরব্দ্ধে রূখে দাঁড়ান। জেহাদ অত্যান্ত পূণ্যের কাজ যদি তা শুধু 'ফি সবিলিললাহ'-র নিয়তে করা হয়। কিন্তু আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে খুশী করা বা দুনিয়া কামানোর উদ্দেশ্যে জেহাদ করা হলে তার কোনো বিণিময় আল্লাহর কাছে পাওয়া যাবে না।

যদি শুধু সুনামের উদ্দেশ্যে অথবা সওয়াব ও সুনাম উভয় উদ্দেশ্যে জেহাদ করা হয় এমতবস্থায় কোনো পূণ্য আশা করা যায় না। এ বিষয়ের উপর একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে আবু উমামা বাহিলী (রাঃ) হতে। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কাছে এসে বললেন, "ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে আপনি কি বলেন, যে ব্যক্তি সওয়াব ও সুনামের জন্য জেহাদ করে, তার জন্য কি রয়েছে? " রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, "তার জন্য কিছুই নেই।" সে ব্যক্তি তা তিনবার পূণরাবৃত্তি করল। রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তিনবারই একই উত্তর দিলেন। তারপর তিনি বললেন, " আল্লাহর্ তা'আলা তাঁর জন্য কৃত খাঁটি আমল ব্যতীত– যা দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া আর কিছুই উদ্দেশ্য না হয়, আর কিছুই কবুল করেন না।" হাদিস, সুনান নাসা্য়ী, নং ৩১৪২।

এখান থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, জেহাদের মত গুরুত্বপূর্ণ এবং ঝুকিপূর্ণ কাজেও আল্লাহর শরীক করা হলে অর্থাৎ রিয়া মিশ্রিত হলে তা প্রত্যখ্যাত হবে এবং আল্লাহর কাছে এর কোন প্রতিদান পাওয়া যাবে না। এখন দেখার বিষয় যে, জেহাদের মধ্যেও কিভাবে রিয়ার সংমিশ্রণ হতে পারে। নিয়ত এবং উদ্দেশ্যের কারণে জেহাদ রিয়ার আমলে পর্যবশিত হতে পারে বিভিন্নভাবে: মানুষের প্রশংসা কুড়ানোর উদ্দেশ্য থাকলে বীর বা বাহাদুর খেতাবে ভূষিত হওয়ার সাধ থাকলে গনিমতের মাল হাসিলের উদ্দেশ্যে থাকলে এবং যে কোন প্রকার পার্থিব সুবিধা আদায়ের জন্য জেহাদ করা হলে। এ বিষয়গুলি পরিহার করে কেবলমাত্র আল্লাহর আদেশ পালনের স্বার্থে এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষে রিয়া মুক্ত জেহাদ পরিচালনা করা হলেই আল্লাহর কাছে তার বিণিময় আশা করা যায়।

কোরবানী: কোরবানীর উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর কাছে নিজেকে সমার্পন করা। যদিও বাহ্যিক আচরণের মাধ্যমে কোরবানী অনুষ্ঠিত হয় তবুও মূল বিষয়টি সম্পূর্ণ আত্মিক।

আল্লাহ বলেছেন,

لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَـٰكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقْوَىٰ مِنكُمْ ۚ

" আল্লাহর নিকট পৌঁছেনা ওগুলির গোশ্ত এবং রক্ত বরং তাঁর কাছে পৌঁছায় তোমাদের তাক্ওয়া।" সুরা হাজ্জ, আয়াত-৩৭।

কিন্তু এক শ্রেণীর মানুষ কোরবানীর মূল উদ্দেশ্যকে পাশ কাটিয়ে লোকপ্রদর্শনীর মাধ্যমে আত্মতৃপ্তি লাভ করার প্রচেষ্টা করে থাকে। কোরবানীর হাটে তাই প্রতিযোগিতা চলে, কে কত বড় এবং বেশী মূল্যের পশুটি ক্রয় করতে সৰম। এবং এই পশুটি কোরবানী করে লোকের প্রশংসা কুড়ায় এবং নিজেকে ধন্য মনে করে থাকে। আল্লাহর সমীপে নিজেকে নিবেদন করার অনুভূতিটুকুও সেখানে

অনুপস্থিত। সুতরাং আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের পরিবর্তে মানুষের প্রশংসা লাভের আকাঙ্খা মূখ্য হওয়াতে এটি রিয়ায় পরিণত হয়।

প্রকাশ্য ছোট শির্ক: প্রকাশ্য ছোট শির্ক বলতে ছোট শিরক সংঘটিত হয় এমন কথা ও কাজকে বোঝানো হয় যা সবাই চোখে দেখতে পায় অথবা কানে শুনতে পায় অথবা অনুভব করতে পারে। এ শির্কের অনেকগুলি প্রশাখা রয়েছে তন্মধ্যে গুরৰত্বপূর্ণ কিছু শির্কের আলোচনা এখানে উপাস্থাপন করার প্রচেষ্টা করা হল:

১। কসমের শিরকঃ কসমের শির্ক বলতে একমাত্র আল্লাহ্র তা'আলা ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তিসত্তা বা বস্তুর নামে কসম খাওয়াকে বুঝান হয়। যেমনঃ বাপ-দাদা, পীর-অলী কিংবা চন্দ্র, সূর্য, মাটি ইত্যাদির নামে কসম করা।

তাই যদি কসম করতেই হয় তাহলে কেবলমাত্র আল্লাহ্র নামেই কসম করার বৈধতা রয়েছে। আল্লাহ ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কোনো সত্তা, ব্যক্তি, প্রাণী বা বস্তুর নামে কসম খাওয়া প্রকাশ্য ছোট শির্ক। এ বিষয়টি রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)- এর হাদিস দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে। এ হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে সাঈদ ইবনে আবী ওবায়দা (রাঃ) থেকে। তিনি বলেন, "একবার ইবনে উমর (রাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে কাবার নামে শপথ করতে শুনে তাকে বলেনঃ আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামে শপথ করা অবৈধ। কেননা আমি রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কিছুর নামে কসম খেল সে শির্ক করল।" হাদিস, তিরমিযী শরীফ, নং ১৪৭৭ অন্য একটি হাদিসে গায়রুল্লাহর নামে শপথ করার নিষিদ্ধতা এবং আল্লাহ্ তা'আলার নামে শপথ করার বৈধতা প্রমাণিত হয়েছে। হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে উমর (রাঃ) থেকে। কিনি বলেন যে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফরমান, "নিশ্চয় আলৱাহ তোমাদেরকে তোমাদের পিতার নামে শপথ করতে বারণ করেছেন। শপথকারী হয় আল্লাহ্র নামে শপথ করবে অথবা চুপ থাকবে।" হাদিস, তিরমিযী শরীফ, নং ১৪৭৬ গায়রুল্লাহর নামে শপথ করার অবৈধতার উপর আর একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে। তিনি বলেন যে, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)বলেছেন, "তোমরা তোমাদের বাপ-দাদার নামে, তোমাদের মায়ের নামে এবং মূর্তির নামে কসম করবে না। আর তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামে শপথ খাবে না।" হাদিস, আবু দাউদ শরীফ, নং ৩২৩৪ উপর্যুপরি হাদিসদৃষ্টে এটা পরিষ্কার বোঝা যায় যে গায়রুল্লাহর নামে কসম করা অবৈধ এবং শির্ক। তাই কোন নবী, রাসূল, ফিরিশতা, জ্বিন, পীর, বুজুর্গ, অলি, পিতা-মাতা বা

ছেলে-সন্তান ইত্যাদি এবং অন্যকোন ব্যক্তি বা সৃষ্ট বস্তুর কসম খাওয়া না জায়েয এবং ছোট শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

২। যাদু-টোনার শিরকঃ যাদুর শির্ক বলতে এমন কতগুলো মন্ত্র-তন্ত্র বা অবোধগম্য শব্দসমষ্টিকে বুঝান হয় যা যাদুকর নিজে মুখ দিয়ে উচ্চারণ করে থাকে আবার কখনো কখনো বিভিন্ন ওষুধ, সুতায় গিরা বা ধুনা দিয়েও যাদু করা হয়। যাদু-টোনা এমন সব অদ্ভুত কর্মকা- যাতে কুফর, শিরক এবং পাপাচার অবলম্বনে জ্বিন ও শয়তানকে সন্তুষ্ট করে তাদের সাহায্য নেওয়া হয় এবং এর মাধ্যমে মানুষের ৰতি সাধন করা হয়। যাদুর বিষয়টি অত্যন্ত দুর্বোধ্য কৌশলগত ব্যাপার এবং এর সঠিক সংজ্ঞা নিরূপণ করাও কষ্টসাধ্য। তবে সাধারণ পরিভাষায় যাদু বলতে এমন বিষয়কে বোঝায়, যাতে জ্বিন ও শয়তানের কারসাজি, কুফরী বাক্যের প্রভাব, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তুর অদৃশ্য প্রভাব, মেসম্যারিজমে কল্পনাশক্তির প্রভাব প্রভৃতি বিষয় বিদ্যমান থাকতে পারে। বিভিন্ন বিষয়ের প্রতিক্রিয়া এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে; মন্ত্র-তন্ত্রের প্রতিক্রিয়া, ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়ের প্রতিক্রিয়া– যেমন জ্বীন-পরী, দানব বা শয়তানের প্রতিক্রিয়া অথবা সম্মোহনী শক্তির প্রতিক্রিয়াও হতে পারে। যাদু সত্য এবং যাদুর মাধ্যমে মানুষের ৰতি সাধিত করার বাস্তবতাও অনস্বীকার্য। তবে যাদু কোন জিনিসের প্রকৃতি পরিবর্তন করতে পারে না’ বরং নকল ও কৃত্রিম ধারণার জন্ম দেয় মাত্র।

এগুলো করতে গেলে জ্বিন ও শয়তানের নামে মানত ও বলি দিতে হয় কিংবা যে কোন উপায়ে তাদের নৈকট্য লাভ করতে হয়–যা কুফর এবং শিরকের অন্তর্গত। যাদুকরেরা ইলমুল গায়েবের দাবী করে থাকে। এটাও একটি মারাত্মক শির্ক। যাদু-টোনা একটি কুফরী কাজ। যাদু চর্চাকারী অর্থাৎ যে যাদুকর তার মন্ত্রবলে কোন জ্বিন বা শয়তানকে বশীভূত করে যাদুর কাজে ব্যবহার করে সে কাফির এবং এ যাদুর সহযোগীতা গ্রহণকারীরাও তাদের দলভুক্ত। বিষয়টি পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে এভাবে,

وَٱتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ ٱلشَّيَـٰطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَـٰنَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَـٰنُ وَلَـٰكِنَّ ٱلشَّيَـٰطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ
ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَآ أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَـٰرُوتَ وَمَـٰرُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَآ إِنَّمَا
نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِۦ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِۦ ۚ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِۦ مِنْ
أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ ٱشْتَرَىٰهُ مَا لَهُۥ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ مِنْ
خَلَـٰقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْاْ بِهِۦٓ أَنفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ١٠٢

“আর সুলাইমানের রাজত্বে শয়তানরা যা আবৃত্তি করতো তারা তা অনুসরণ করেছে। আর সুলাইমান কুফরী করেননি, বরং শয়তানরাই কুফরী করেছিল। তারা মানুষকে শিক্ষা দিত যাদু ও (সে বিষয় শিক্ষা দিত) যা বাবিল শহরে হারূত ও মারূত ফিরিশতাদ্বয়ের উপর নাযিল হয়েছিলো। তারা উভয়েই এই কথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিত না যে, আমরা নিছক একটি পরীক্ষা ; কাজেই তুমি কুফরী করো না।’ তা সত্বেও তারা ফিরিশতাদ্বয়ের কাছ থেকে এমন যাদু শিখতো যা দ্বারা

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতো। অথচ তারা আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যাতীত তা দ্বারা কারো ক্ষতি করতে পারতো না। আর তারা তা-ই শিখতো যা তাদের ক্ষতি করতো এবং কোনো উপকারে আসত না আর তারা নিশ্চিত জানে যে, যে কেউ তা খরিদ করে, (অর্থাৎ যাদুর আশ্রয় নেয়) তার জন্য আখেরাতে কোনো অংশ নেই। যার বিনিময়ে তারা নিজেদের বিকিয়ে দিচ্ছে, তা খুবই মন্দ, যদি তারা জানতো ! ” আল কোরআন, সুরা বাকারা, আয়াত -১০২।

হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর ঘটনা এবং যাদুর মূল তত্ত্বের উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা,

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর নিকট একটি আংটি ছিল। পায়খানায় গেলে তিনি ওটা তার স্ত্রী জারাদার নিকট রেখে যেতেন। হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর পরীক্ষার সময় এলে একটি শয়তান জ্বীন তার রূপ ধরে তার স্ত্রীর নিকট আসে এবং আংটি চায়। তা তাকে দিয়ে দেয়া হয়। সে তা পরে হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর সিংহাসনে বসে যায়। সমস্ত জ্বীন, মানব ও শয়তান তার খিদমতে হাজির হয়। সে শাসন কার্য চালাতে থাকে। এদিকে হযরত সুলাইমান (আঃ) ফিরে এসে তার স্ত্রীর নিকট আংটি চান। তাঁর স্ত্রী বলেনঃ তুমি মিথ্যাবাদী। তুমি সুলাইমান (আঃ) নও। সুলাইমান (আঃ) তো আংটিটি নিয়েই গেছেন।'

হযরত সুলাইমান (আঃ) বুঝে নেন যে, এটা হচ্ছে মহান আল্লাহর পক্ষ হতে তার উপর পরীক্ষা। এ সময়ে শয়তানরা যাদু বিদ্যা, জ্যোতিষ বিদ্যা এবং ভবিষ্যতের সত্য-মিথ্যা খবরের কতকগুলো কিতাব লিখে এবং ওগুলো হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর সিংহাসনের নীচে পুঁতে রাখে। হযরত সুলাইমান (আঃ) এর পরীক্ষার যুগ শেষ হলে পুনরায় তিনি সিংহাসন ও রাজপাটের মালিক হয়ে যান। স্বাভাবিক বয়সে পৌছে যখন তিনি রাজত্ব হতে অবসর গ্রহণ করেন, তখন শয়তানরা জনগণকে বলতে শুরু করে যে, হযরত সুলাইমানের (আঃ) ধনাগার এবং ঐ পুস্তক যার বলে তিনি বাতাস ও জ্বীনদের উপর শাসনকার্য চালাতেন তা তাঁর সিংহাসনের নীচে পোঁতা রয়েছে। জ্বীনেরা ঐ সিংহাসনের নিকটে যেতে পারতো না বলে মানুষেরা ওটা খুঁড়ে ঐ সব পুস্তক বের করে। সুতরাং বাইরে এর আলোচনা হতে থাকে এবং প্রত্যেকেই এ কথা বলে যে, হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর রাজত্বের রহস্য এটাই ছিল। এমনকি জনগণ হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর নবুওয়াতকেও অস্বীকার করে বসে এবং তাঁকে যাদুকর বলতে থাকে। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সত্যতা অস্বীকার করেন এবং আল্লাহর ফরমান জারী হয় যে, যাদু বিদ্যার এ কুফরী শয়তানরা ছড়িয়ে ছিল। হযরত সুলাইমান (আঃ) ওটা হতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট একটি লোক আগমন করলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেনঃ “কোথা হতে আসছো?' সে বলেঃ ইরাক হতে। তিনি বলেনঃ ইরাকের কোন শহর হতে?' সে বলেঃ কুফা হতে। তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ “তথাকার সংবাদ কি?' সে বলেঃ তথায় আলোচনা হচ্ছে যে, হযরত আলী (রাঃ) মারা যাননি; বরং তিনি জীবিত আছেন এবং সত্বরই আসবেন। একথা শুনে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) কেঁপে উঠেন এবং বলেনঃ 'এটা সত্য হলে আমরা তাঁর মীরাস বন্টন

করতাম না। আর তাঁর স্ত্রীগণকে বিয়ে করতাম। শুন! শয়তানরা আকাশবানী চুরি করে শুনে নিতে এবং তাদের নিজস্ব কথা মিলিয়ে দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিতো।

হযরত সুলাইমান (আঃ) ঐ সব পুস্তক জমা করে তার সিংহাসনের নীচে পুঁতে দেন। তার মৃত্যুর পর জ্বীনেরা পুনরায় তা বের করে নেয়। ঐ পুস্তকগুলো ইরাকের মধ্যেও ছড়িয়ে রয়েছে এবং ঐ পুস্তকগুলোর কথাই তারা বর্ণনা করছে, ছড়িয়ে দিচ্ছে। এ আয়াতে ওরই বর্ণনা রয়েছে।

সেই যুগে এটাও প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল যে, শয়তানরা ভবিষ্যত জানে। হযরত সুলাইমান (আঃ) এই পুস্তকগুলো বাক্সে ভরে পুঁতে ফেলার পর এই নির্দেশ জারী করেন যে, যে একথা বলবে তার মাথা কেটে নেয়া হবে।

কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর ইন্তেকালের পর জীনেরা ঐ পুস্তকগুলো তাঁর সিংহাসনের নীচে পুঁতে রাখে এবং ওর প্রথম পষ্ঠায় লিখে রাখেঃ "এই জ্ঞানভাণ্ডার 'আসিফ বিন রখিয়া কর্তৃক সংগ্রহ করা হয়েছে, যিনি হযরত সুলাইমান বিন দাউদের (আঃ) প্রধানমন্ত্রী, বিশিষ্ট পরামর্শ দাতা এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন।" ইয়াহূদীদের মধ্যে এটা ছড়িয়ে পড়েছিল যে, হযরত সুলাইমান (আঃ) নবী ছিলেন না, বরং যাদুকর ছিলেন। এই কারণেই উপরোক্ত আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। আল্লাহর সত্য নবী (সঃ) অন্য এক সত্য নবীকে (আঃ) কালিমামুক্ত করেন এবং ইয়াহুদীদের বদ-আকীদার অসারতা ঘোষণা করেন। তারা হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর নাম নবীদের নামের তালিকাভুক্ত শুনে ক্রোধে জ্বলে উঠতো। এজন্যেই এ ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এটাও একটা কারণ যে, হযরত সুলাইমান (আঃ) কষ্টদায়ক প্রাণী হতে কষ্ট না দেয়ার অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। তাদেরকে ঐ অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেই তারা কষ্ট দেয়া হতে বিরত থাকতো। অতঃপর জনগণ নিজেরাই কথা বানিয়ে নিয়ে যাদু মন্ত্র ইত্যাদির সম্বন্ধ হযরত সুলাইমান (আঃ) এর সঙ্গে লাগিয়ে দেয়। ওর অসারতা এই পবিত্র আয়াতে রয়েছে। এখানে عَلٰى শব্দটি فِىْ-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে কিংবা تَتْلُوْا শব্দটি تَكْذِبُ-এর অন্তর্ভুক্ত। আর এটাই উত্তম। আল্লাহ তাআলাই সবচেয়ে বেশী জানেন।

হযরত হাসান বসরী (রঃ)-এর উক্তি আছে যে, যাদু হযরত সুলাইমান (আঃ) এর পূর্বেও ছিল। এটা সম্পূর্ণ সত্য কথা। হযরত সুলাইমান (আঃ) হযরত মুসা (আঃ)-এর পর যুগের নবী। আর হযরত মূসা (আঃ)-এর যুগে যাদুকরদের বিদ্যমানতা কুরআন মাজীদ দ্বারাই সাব্যস্ত হয়েছে এবং হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর আগমন হযরত মূসা (আঃ)-এর পরে হওয়াও কুরআন কারীম দ্বারাই প্রকাশ পেয়েছে। হযরত দাউদ (আঃ) ও জালুতের ঘটনায় আছেঃ مِنْ بَعْدِ مُوْسٰى অর্থাৎ মূসা (আঃ)-এর পরে। এমনকি হযরত ইবরাহীম (আঃ) اِنَّمَا اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ-এরও পূর্বে হযরত সালিহ (আঃ)কে তার কওম' বলেছিলঃঅর্থাৎ তুমি যাদুকৃত লোকদের অন্তর্ভুক্ত। (২৬:১৮৫)

অতঃপর আল্লাহ বলেন وَمَاأُنْزِلَ কেউ কেউ বলেন যে, এখানে مَا শব্দটি না বাচক এবং ওর সংযোগ রয়েছে। مَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ-এর উপর।

ইয়াহুদীদের আর একটি বদ-আকীদা ছিল এই যে, ফেরেশতাদের উপর যাদু অবতীর্ণ হয়েছে। এ আয়াতে তাকেই খণ্ডন করা হয়েছে। هَارُوْت ও مَارُوْت শব্দ দুটি شَيَاطِيْن হতে بَدَلْ হয়েছে। দ্বিবচনের উপরও বহু বচনের প্রয়োগ হয়ে থাকে। যেমন- اِنْ كُنَّ لَهٗ اِخْوَةٌ-এর মধ্যে রয়েছে। কিংবা তাদের

অনুসারীদেরকে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত করে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে এবং তাদের দুজনের নাম খুবই অবাধ্যতার কারণে প্রকাশ করা হয়েছে।

কুরতুবী (রঃ) তো বলেন এটাই সঠিক ভাব। এছাড়া অন্য ভাব নেয়ার প্রয়োজন নেই। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যাদু আল্লাহু, নাযিল করেননি। রাবী' বিন আনাস (রঃ) বলেন যে, তাদের উপর কোন যাদু অবতীর্ণ হয়নি। এর উপর ভিত্তি করে আয়াতের তরজমা হবে এইঃ 'ঐ ইয়াহুদীরা ঐ জিনিসের অনুসরণ করেছে যা শয়তানরা হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর যুগে পড়তো। হযরত সুলাইমান (আঃ) কুফরী করেনি, না আল্লাহ তা'আলা ঐ দু' ফেরেশতার উপর যাদু অবতীর্ণ করেছেন; (যেমন-হে ইয়াহুদী! জিবরাঈল (আঃ) ও মীকাঈলের (আঃ) প্রতি তোমাদের ধারণা রয়েছে) বরং এ কুফরী ছিল শয়তানদের, যারা বাবেলে জনগণকে যাদু শিখাতো এবং তাদের সরদার ছিল মানুষ, যাদের নাম ছিল হারূত ও মারূত। হযরত আবদুর রহমান বিন আবৃজা (রঃ) নিম্নরূপ পড়তেনঃ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ دَاوٗدَ وَسُلَيْمَانَ অর্থাৎ দাউদ ও সুলাইমান এই দু'বাদশাহর উপরেও যাদু অবতীর্ণ করা হয়নি? ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) একে শক্তভাবে খণ্ডন করেছেন। তিনি বলেন যে, مَا শব্দটি اَلَّذِیْ অর্থে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। আর হারুত ও মারূত দুজন ফেরেশতা। তাদেরকে আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন এবং বান্দাদেরকে পরীক্ষা করার জন্যে তাদেরকে যাদু বিদ্যা শিক্ষা দিতে ঐ দু'ফেরেশতাকে অনুমতি দিয়েছিলেন। তাই তারা আল্লাহর সে আদেশ পালন করেছিলেন।

একটি দুর্বল মত এও আছে যে, এটা জ্বীনদের দু'টি গোত্র। مَلَكَيْنِ দু'বাদশাহর কিরআতে أُنْزِلَ-এর অর্থ হবে সৃষ্টি করা। যেমন, আল্লাহ পাক বলেছেনঃ وَ اَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ الْاَنْعَامِ ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ অর্থাৎ তিনি তোমাদের জন্যে আট প্রকারের চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন।' (৩৯:৬) আরও বলেছেনঃ وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ অর্থাৎ আমি লোহা সৃষ্টি করেছি।' (৫৭:২৫) হাদীসের মধ্যেও اِنْزَالٌ শব্দটি সৃষ্টি করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমনঃ مَااَنْزَلَ اللهُ دَاءً الخ অর্থাৎ 'আল্লাহ যতগুলো রোগ সৃষ্টি করেছেন, ওগুলোর ওষুধও সৃষ্টি করেছেন। উপরোক্ত সব স্থানেই اِنْزَالٌ শব্দটি সৃষ্টি করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে; আনা বা অবতীর্ণ করা অর্থে নয়। দ্রূপ এ আয়াতেও।

পূর্ব যুগীয় অধিকাংশ মনীষীদের মাযহাব এই যে, এই দু'জন ফেরেশতা ছিলেন। একটি মারফু হাদীসেও এ বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে, যা ইনশাআল্লাহ এখনই বর্ণিত হচ্ছে। কেউ যেন এ প্রশ্ন উত্থাপন না করেন যে, ফেরেশতাগণ তো নিস্পাপ। তাদের দ্বারা তো পাপকার্য হতেই পারে না। অথচ জনগণকে যাদু শিক্ষা দেয়া, এতো কুফরী? এ প্রশ্ন উত্থিত হতে পারে না। কেননা, এ দু'জন ফেরেশতা সাধারণ ফেরেশতাগণ হতে পৃথক হয়ে যাবে, যেমন ইবলিস পৃথক হয়েছে।

হযরত আলী (রাঃ), হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ), হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত ইবনে উমার (রাঃ), হযরত কাবুল আহবার (রঃ), হযরত সুদ্দী (রঃ) এবং হযরত কালবী (রঃ) এটাই বলেন।

হযরত আবদুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)কে বলতে শুনেছেনঃ যখন আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আঃ)কে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেন এবং তাঁর সন্তানেরা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, অতঃপর তারা আল্লাহর নাফরমানী করতে থাকে, তখন ফেরেশতগণ পরস্পর বলাবলি করেন- "দেখ এরা কত দুষ্ট প্রকৃতির লোকে এবং এরা কতই না

অবাধ্য! আমরা এদের স্থলে থাকলে কখনও আল্লাহর অবাধ্য হতাম না-তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বলেনঃ "তোমরা তোমাদের মধ্য হতে দু'জন ফেরেশতাকে নিয়ে এসো; আমি তাদের মধ্যে মানবীয় প্রবৃত্তি সৃষ্টি করতঃ তাদেরকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিচ্ছি; তার পরে দেখা যাক তারা কি করে। তারা তখন হারূত ও মারূতকে হাজির করেন। আল্লাহ তাআলা তাদের মধ্যে মানবীয় প্রবৃত্তি সৃষ্টি করতঃ তাদেরকে বলেনঃ "দেখ, বানী আদমের নিকট তো আমি নবীদের মাধ্যমে আমার আহ্কাম পৌছিয়ে থাকি; কিন্তু তোমাদেরকে মাধ্যম ছাড়াই স্বয়ং আমি বলে দিচ্ছি। আমার সাথে কাউকেও অংশীদার করবে না, ব্যভিচার করবে না এবং মদ্যপানও করবে না।

তখন তারা দুজন পৃথিবীতে অবতরণ করে। তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্যে আল্লাহ তাআলা যুহরাকে একটি সুন্দরী নারীর আকারে তাদের নিকট পাঠিয়ে দেন। তারা তাকে দেখেই বিমোহিত হয়ে পড়ে এবং তার সাথে ব্যভিচার করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। সে বলেঃ তোমারা শিরক করলে আমি সম্মত আছি।' তারা উত্তর দেয়ঃ 'এটা আমাদের দ্বারা হবে না। সে চলে যায়। আবার সে এসে বলেঃ তোমরা যদি এই শিশুটিকে হত্যা কর তবে আমি তোমাদের মনোবাসনা পূর্ণ করতে সম্মত হবো। তারা ওটাও প্রত্যাখ্যান করে। সে আবার আসে এবং বলেঃ আচ্ছা, এই মদ পান করে নাও। তারা ওটাকে ছোট পাপ মনে করে তাতে সম্মত হয়ে যায়। এখন তারা নেশায় উন্মত্ত হয়ে ব্যভিচারও করে বসে এবং শিশুটিকে হত্যা করে ফেলে।

তাদের চৈতন্য ফিরে আসলে ঐ স্ত্রীলোকে তাদেরকে বলেঃ যে যে কাজ - করতে তোমরা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছিলে তা সবই করে ফেলেছে। তারা তখন লজ্জিত হয়ে যায়। তাদেরকে দুনিয়ার শাস্তি বা আখেরাতের শাস্তির যে কোন একটি গ্রহণ করার অধিকার দেয়া হয়। তারা দুনিয়ার শাস্তি পছন্দ করে। সহীহ ইবনে হিব্বান, মুসনাদ-ই- আহমাদ, তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই এবং তাফসীর-ই-ইবনে জারীরের মধ্যে এ হাদীসটি বিভিন্ন শব্দে বর্ণিত আছে। মুসনাদ-ই-আহমাদের এ বর্ণনাটি গরীব। ওর মধ্যে একজন বর্ণনাকারী মূসা বিন যুবাইর আনসারী রয়েছে-ইবনে আবি হাতিমের (রঃ) মতে সে নির্ভরযোগ্য নয়। তাফসীর-ই- ইবনে মিরদুওয়াই এর মধ্যে একটি বর্ণনায় এও রয়েছে যে, একদা রাত্রে হযরত আবদুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) হযরত নাফে' (রাঃ)কে জিজ্ঞেস করেনঃ যুহরা তারকাটি বের হয়েছে কি?' তিনি বলেনঃ 'না'। দুতিন বার প্রশ্নের পর বলেনঃ এখন উদিত হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) তখন বলেন ' ও যেন খুশিও না হয় এবং ওর আনন্দ লাভও যেন না হয়। হযরত নাফে (রাঃ) তখন তাকে বলেনঃ জনাব, একটি তারকা যা আল্লাহ পাকের নির্দেশক্রমে উদিত ও অস্তমিত হয় তাকে আপনি মন্দ বলেন?' তিনি তখন বলেনঃ তবে শুনুন জনাব আমি ঐ কথাই বলছি যা রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর নিকট হতে শুনেছি। অতঃপর উল্লিখিত হাদীসটি শব্দের বিভিন্নতার সাথে বর্ণনা করেন। কিন্তু এটাও গরীব বা দুর্বল। হযরত কা'ব (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি মারফু হওয়া অপেক্ষা মাওকুফ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। সম্ভবতঃ এটা ইসরাঈলী বর্ণনাই হবে। আল্লাহ তাআলাই এ সম্পর্কে সবচেয়ে ভাল জানেন। সাহাবা (রাঃ) এবং তাবেঈন (রাঃ) হতেও এ ধরনের বহু বর্ণনা করা হয়েছে।

কেউ কেউ বলেন যে, যুহরা একটি স্ত্রী লোক ছিল। সে ফেরেশতাদের সাথে শর্ত করে বলেছিলঃ ' তোমরা আমাকে ঐ দোআটি শিখিয়ে দাও যা পড়ে তোমরা আকাশে উঠে থাকো। তারা তাকে তা শিখিয়ে দেয়। সে এটা পড়ে আকাশে উঠে যায় এবং তথায় তাকে তারকায় রূপান্তরিত করা হয়।

কতকগুলো মারফু বর্ণনায়ও এটা আছে; কিন্তু ওটা মুকার ও বে-ঠিক। অন্য একটি বর্ণনায় আছে যে, এ ঘটনার পূর্বে তো ফেরেশতাগণ শুধুমাত্র মুমিনদের জন্যই ক্ষমা প্রার্থনা করতেন, কিন্তু এর পর তারা সারা দুনিয়াবাসীর জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করতে আরম্ভ করেন।

কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, যখন এই ফেরেশতাদ্বয় হতে এ অবাধ্যতা প্রকাশ পায় তখন অন্যান্য ফেরেশতাগণ স্বীকার করেন যে, বানী আদম আল্লাহ পাক হতে দূরে রয়েছে এবং তাকে না দেখেই ঈমান এনেছে, সুতরাং তাদের ভুল হওয়া অস্বাভাবিক নয়। ঐ ফেরেশতাদ্বয়কে বলা হয়ঃ তোমরা দুনিয়ার শাস্তি গ্রহণ করে নাও, অথবা পরকালের শাস্তির জন্যে প্রস্তুত হয়ে যাও।' তারা দুজন পরামর্শ করে দুনিয়ার শাস্তিই গ্রহণ করে। কেননা, এটা অস্থায়ী এবং পরকালের শাস্তি চিরস্থায়ী। সুতরাং বাবেলে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে।

একটি বর্ণনায় আছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যে নির্দেশাবলী দিয়েছিলেন তাতে হত্যা ও অবৈধ মালের উপর নিষেধাজ্ঞা ছিল এবং এ হুকুমও ছিল যে,তারা যেন ন্যায়ের সঙ্গে বিচার করে। এও এসেছে যে, তারা তিনজন ফেরেশতা ছিল। কিন্তু একজন পরীক্ষায় অংশ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়ে ফিরে যায়। অতঃপর দু'জনের পরীক্ষা নেয়া হয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এটা হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর যুগের ঘটনা। এখানে বাবেল দ্বারা দুনিয়ায় অন্দের বাবেলকে বুঝান হয়েছে। স্ত্রীলোকটির নাম আরবী ভাষায় ছিল যুহরা' বানতী ভাষায় ছিল 'বেদখত্ এবং ফারসী ভাষায় ছিল 'আনাহীদ'। এ স্ত্রীলোকেটি তার স্বামীর বিরুদ্ধে একটি মোকাদ্দমা এনেছিল। যখন তারা তার সাথে অসৎ কাজের ইচ্ছে করে তখন সে বলে-যদি আগে আমাকে আমার স্বামীর বিরুদ্ধে ফায়সালা দাও তবে আমি সম্মত আছি। তারা তাই করে। পুনরায় সে বলেঃ 'তোমরা যা পড়ে আকাশে উঠে থাকো ও পড়ে নীচে নেমে আস ওটাও আমাকে শিখিয়ে দাও। তারা ওটাও তাকে শিখিয়ে দেয়। সে ওটা পাঠ করে আকাশে উঠে যায়। কিন্তু নীচে নেমে আসার দু'আ ভুলে যায়। সেখানেই তার দেহকে তারকায় রূপান্তরিত করা।

হযরত আবদুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) কখনও যুহরা তারকা দেখলে তাকে অভিশাপ দিতেন। যখন এই ফেরেশতারা আকাশে উঠতে চাইলো কিন্তু উঠতে পারলো না। তখন তারা বুঝে নিলো যে, এখন তাদের ধ্বংস অনিবার্য।

হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, প্রথম কিছুদিন তো এই ফেরেশতারা স্থিরই। ছিল। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ন্যায়ের সঙ্গে বিচার করতো এবং সন্ধ্যার পর। আকাশে উঠে যেতো। অতঃপর যুহরাকে দেখে নিজেদের নফসকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। যুহরা তারকাকে একটি সুন্দরী স্ত্রীর আকৃতিতে তাদের নিকট। পাঠিয়ে দেয়া হয়। মোট কথা, হারুত ও মারূতের এ ঘটনা তাবেঈগণের মধ্যেও বহু লোক বর্ণনা করেছেন। যেমন, মুজাহিদ (রঃ), সুদ্দী (রঃ), হাসান বসরী (রঃ), মুকাতিল বিন হিব্বান (রঃ) প্রভৃতি। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মুফাসসিরগণও নিজ নিজ তাফসীরে এটা এনেছেন। কিন্তু এর অধিকাংশই বানী ইসরাঈলের কিতাবসমূহের উপর নির্ভরশীল। এ অধ্যায়ে কোন সহীহ মারফু মুত্তাসিল হাদীস রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে সাব্যস্ত নেই। আবার কুরআন হাদীসের মধ্যেও বিস্তারিত ব্যাখ্যা নেই। সুতরাং আমাদের ঈমান ওর উপরেই রয়েছে যে, যেটুকু কুরআন মাজীদে আছে ওটাই সঠিক। আর প্রকৃত অবস্থা একমাত্র আল্লাহ পাকই জানেন।

তাফসীর-ই-ইবনে জারীরের মধ্যে একটি দুর্বল হাদীস রয়েছে, যাতে একটি বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পরলোক গমনের অল্প দিন পরে দাওমাতুল জানাল' হতে একটি স্ত্রীলোক তার খোঁজে আগমন করে। তার মৃত্যু সংবাদ পেয়েই সে উদ্বিগ্ন হয়ে কাঁদতে আরম্ভ করে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করি- ব্যাপার কি? সে বলেঃ আমার মধ্যে ও আমার স্বামীর মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ প্রায় লেগেই থাকতো। একবার সে আমাকে ছেড়ে কোন্ অজানা জায়গায় চলে যায়। একটি বৃদ্ধার নিকট আমি এসব কিছু বর্ণনা করি। সে আমাকে বলে- "তোমাকে যা বলি তাই কর, সে আপনা আপনি চলে আসবে। আমি প্রস্তুত হয়ে গেলাম। রাত্রে সে দুটি কুকুর নিয়ে আমার নিকট আগমন করে। একটির উপর সে আরোহণ করে এবং অপরটির উপর আমি আরোহণ করি। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা দু'জন বাবেলে চলে যাই। তথায় গিয়ে দেখি যে, দু'টি লোক শৃংখলে আবদ্ধ অবস্থায় লটকানো রয়েছে। ঐ বৃদ্ধা আমাকে বলে-তাদের নিকট যাও ও বল-"আমি যাদু শিখতে এসেছি। আমি তাদেরকে একথা বলি। তারা বলে-'জেনে রেখো, আমরা তো পরীক্ষার মধ্যে রয়েছি। তুমি যাদু শিক্ষা করো যাদু শিক্ষা করা কুফরী।' আমি বলি- শিখবো। তারা বলে-"আচ্ছা, তাহলে যাও, ঐ চুল্লীর মধ্যে প্রস্রাব করে চলে এসো। আমি গিয়ে প্রস্রাবের ইচ্ছে করি, কিন্তু আমার অন্তরে কিছুটা ভয়ের সঞ্চার হয়, সুতরাং আমি ফিরে এসে বলিআমি কাজ সেরে এসেছি। তারা আমাকে জিজ্ঞেস করে -"তুমি কি দেখলে আমি বলি-"কিছুই না। তারা বলে-"তুমি ভুল বলছো। এখন পর্যন্ত তুমি বিপথে চালিত হওনি। তোমার ঈমান ঠিক আছে, তুমি এখনও ফিরে যাও এবং কুফরী করো না। আমি বলি-"আমাকে যে যাদু শিখতেই হৰে। তারা পুনরায় আমাকে বলে-ঐ চুল্লীতে প্রস্রাব করে এসো। আমি আবার যাই। কিন্তু এবারও। মন চায় না, সুতরাং ফিরে আসি। আবার এভাবেই প্রশ্ন ও উত্তর হয়। পুনরায় আমি চুল্লীর নিকট যাই এবং মনকে শক্ত করে প্রস্রাব করতে বসে পড়ি। আমি দেখি যে, একজন ঘোড়া সওয়ার মুখের উপর পর্দা ফেলে আকাশের উপর উঠে গেল। আমি ফিরে এসে তাদের নিকট এটা বর্ণনা করি। তারা বলে- 'হাঁ, এবার তুমি সত্য বলছো। ওটা তোমার ঈমান ছিল, যা তোমার মধ্য হতে বেরিয়ে গেল। এখন চলে যাও।

আমি এসে ঐ বৃদ্ধাকে বলি- 'তারা আমাকে কিছুই শিক্ষা দেয়নি। সে বলে- যথেষ্ট হয়েছে। তোমার নিকট সবই চলে এসেছে। এখন তুমি যা বলবে তাই হবে। আমি পরীক্ষামূলকভাবে একটি গমের দানা নিয়ে মাটিতে ফেলে দেই। অতঃপর বলি- গাছ হও।' ওটা গাছ হয়ে গেল। আমি বলি-- তোমাতে ডাল পাতা গজিয়ে যাক।' তাই হয়ে গেল। তার পর বলি- 'শুকিয়ে যাও।' ডালপাতা শুকিয়ে গেল। অতঃপর বলি-'পৃথক পৃথকভাবে দানা দানা হয়ে যাও। ওটা তাই হয়ে গেল। তারপরে আমি বলি-শুকিয়ে যাও। ওটা শুকিয়ে গেল। অতঃপর বলি-আটা হয়ে যাও।' আটা হয়ে গেল। আমি বলি- রুটি হয়ে যাও।' রুটি হয়ে গেল। এটা দেখেই আমি লজ্জিত হয়ে যাই এবং বে-ঈমান হয়ে যাওয়ার কারণে আমার খুবই দুঃখ হয়। হে উম্মুল মু'মিনীন! আল্লাহর শপথ! আমি যাদুর দ্বারা কোন কামও নেইনি এবং কারও উপর এটা প্রয়োগও করিনি। এভাবে কাঁদতে কাঁদতে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে হাজির হওয়ার উদ্দেশ্যে এসেছি। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁকে পেলাম না। এখন আমি কি করি?

একথা বলেই সে পুনরায় কাঁদতে আরম্ভ করে এবং এত কাঁদে যে, সবারই মনে তার প্রতি দয়ার সঞ্চার হয়। তাকে কি ফতওয়া দেয়া যেতে পারে এ ব্যাপারে সাহাবীগণও (রাঃ) খুবই উদ্বিগ্ন ছিলেন।

অবশেষে তারা বলেন- এখন এ ছাড়া আর কি হবে যে, তুমি এ কাজ করবে না, তাওবা করবে এবং মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আর পিতা-মাতার খিদমত করবে। এই ইসনাদ সম্পূর্ণ সঠিক।

কেউ কেউ বলেন যে, যাদুর বলে প্রকৃত জিনিসই পরিবর্তিত হয়ে যায়। আবার কেউ কেউ বলেন যে, না, দর্শকের শুধু এর ধারণা হয়ে থাকে মাত্র, প্রকৃত জিনিস যা ছিল তাই থাকে। যেমন কুরআন পাকে রয়েছেঃ অর্থাৎ তারা মানুষের চোখে যাদু করে দিয়েছে।' سَحَرُوْا اَعْيُنَ النَّاسِ (৭:১১৬) অন্যত্র আল্লাহ পাক বলেন অর্থাৎ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى হযরত মূসার (আঃ) মনে এ ধারণা দেয়া হয়েছে যে, যেন ঐ সাপগুলো তাদের যাদুর বলে চলাফেরা করছে।' (২০:৬৬) এ ঘটনা দ্বারা এটাও জানা যাচ্ছে যে, এ আয়াতে বাবেল' শব্দ দ্বারা ইরাকের বাবেলকে বুঝানো হয়েছে, দুনিয়া অন্দের' বাবেল নয়। মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমের একটি বর্ণনায় আছে যে, হযরত আলী ইবনে আবূ তাবিল (রাঃ) বাবেলের পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আসরের নামাযের সময় হলে তিনি তথায় নামায আদায় করলেন না, বরং বাবেলের সীমান্ত পার হয়ে নামায পড়লেন। অতঃপর বললেনঃ 'আমার প্রিয় রাসূল (সঃ) আমাকে গোরস্থানে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন এবং বাবেলের ভূমিতেও নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। এটা অভিশপ্ত ভূমি। সুনান-ই-আবি দাউদের মধ্যেও এ হাদীসটি বর্ণিত আছে। ইমাম আবু দাউদ (রঃ) এ হাদীসের উপর কোন সমালোচনা করেননি। আর যে হাদীসকে ইমাম আবু দাউদ (রঃ) স্বীয় কিতাবে নিয়ে আসেন এবং ওর সনদের উপর নীরবতা অবলম্বন করেন ঐ হাদীস ইমাম সাহেবের মতে হাসান হয়ে থাকে। এর দ্বারা জানা গেল যে, বাবেলের ভূমিতে মামায পড়া মাকরূহ। যেমন সামুদ সম্প্রদায়ের ভূমি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'তাদের বাস ভূমিতেও যেয়ো না। যদি ঘটনাক্রমে যেতেই হয়, তবে আল্লাহর ভয়ে কাঁদতে কাঁদতে যাও।

আল্লাহ তা'আলা হারুত ও মারূতের মধ্যে ভাল-মন্দ, কুফর ও ঈমানের জ্ঞান দিয়ে রেখেছিলেন বলে তারা কুফরীর দিকে গমনকারীদের উপদেশ দিতো। এবং তাদেরকে ওটা হতে বিরত রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করতো। কিন্তু যখন কোনক্রমেই মানতো না তখন তাদেরকে যাদু বিদ্যা শিখিয়ে দিতো। ফলে তাদের ঈমানের আলো বিদায় নিতে এবং যাদু চলে আসতো। শয়তান তাদের বন্ধু হয়ে যেতো। ঈমান বিদায় নেয়ার পর আল্লাহর অভিশাপ তাদের উপর নেমে আসতো। ইবনে জুরাইজ (রঃ) বলেন যে, কাফির ছাড়া আর কেউ যাদু বিদ্যা শিখবার সৎ সাহস রাখতে পারে না। فِتْنَةٌ শব্দের অর্থ এখানে বিপদ, আজমায়েশ ও পরীক্ষা। এ আয়াতের মাধ্যমে এটাও জানা গেল যে, যাদু বিদ্যা শিক্ষা করা কুফরী।

হাদীসের মধ্যেও আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কোন যাদুকরের নিকট গমন করে এবং তার কথাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে, সে মুহাম্মদ (সঃ)-এর উপর নাযিলকৃত ওয়াহীর সাথে কুফরী করে। (বার)'। এ হাদীসটি বিশুদ্ধ এবং-এর সমর্থনে অন্যান্য হাদীসও এসেছে।

অতঃপর বলা হচ্ছে যে, মানুষ হারুত ও মারূতের কাছে গিয়ে যাদু বিদ্যা শিক্ষা করতো। ফলে তারা খারাপ কাজ করতো এবং স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে যেতো। সহীহ মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ শয়তান তার সিংহাসনটি পানির উপর রাখে। অতঃপর মানুষকে বিপথে চালানোর জন্যে সে তার সেনাবাহিনীকে পাঠিয়ে দেয়। সেই তার নিকট সবচেয়ে সম্মানিত

যে হাঙ্গামা সৃষ্টির কাজে সবচেয়ে বেড়ে যায়। এরা ফিরে এসে নিজেদের জঘন্যতম কার্যাবলীর বর্ণনা দেয়। কেউ বলেঃ আমি অমুককে এভাবে পথ ভ্রষ্ট করেছি। কেউ বলেঃ আমি অমুক ব্যক্তিকে এ পাপ কার্য করিয়েছি। শয়তান তাদেরকে বলেঃ 'বো কিছুই করনি। এতো সাধারণ কাজ। অবশেষে একজন এসে বলেঃ আমি একটি নোক ও তার স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া বাধিয়ে দিয়েছি, এমনকি তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে গেছে। শয়তান তখন তার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বলেঃ হ, তুমি বড় কাজ করেছে। সে তাকে পার্শ্বে বসিয়ে নেয় এবং তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেয়।'

যাদুকরও তার যাদুর দ্বারা ঐ কাজই করে থাকে, যার ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদের সৃষ্টি হয়। যেমন তার কাছে স্ত্রীর আকৃতি খারাপ মনে হবে কিংবা তার স্বভাব চরিত্রকে সে ঘৃণা করবে অথবা অন্তরে শত্রুতার ভাব জেগে যাবে ইত্যাদি। আস্তে আস্তে এসব বৃদ্ধি পেয়ে যাবে এবং শেষ পর্যন্ত তাদের মধ্যে বিচ্ছেদই ঘটে যাবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, যাদু দ্বারা আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কোন ক্ষতি সাধিত হয় না। অর্থাৎ ক্ষতি সাধন করা তাদের ক্ষমতার মধ্যেই নেই। আল্লাহর ভাগ্য লিখন অনুযায়ী তার ক্ষতিও হতে পারে, আবার তার ইচ্ছে হলে যাদু নিষ্ক্রিয়ও হতে পারে। ভাবার্থ এও হতে পারে যে, যাদু শুধুমাত্র ঐ ব্যক্তিরই ক্ষতি করে থাকে, যে ওটা লাভ করে ওর মধ্যে প্রবেশ করে।

এরপর আল্লাহ পাক বলেন যে, তারা এমন জিনিস শিক্ষা করে যা তাদের জন্যে শুধু ক্ষতিকারক, যার মধ্যে উপকার মোটেই নেই। ঐ ইয়াহুদীরা জানে যে,যারা আল্লাহর রাসূলের (সঃ) আনুগত্য ছেড়ে যাদুর পিছনে লেগে থাকে তাদের জন্যে আখেরাতের কোনই অংশ নেই। তাদের না আছে আল্লাহর কাছে কোন সম্মান, না তাদেরকে ধর্মভীরু মনে করা হয়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, যদি তাদের এ মন্দ কাজের অনুভূতি হতো এবং ঈমান এনে খোদাভীরুতা অবলম্বন করতো তবে ওটা নিঃসন্দেহে তাদের জন্যে মঙ্গলজনক ছিল। কিন্তু এরা অজ্ঞান ও নির্বোধ।

অন্য জায়গায় আল্লাহ পাক বলেনঃ "জ্ঞানীগণ বলে- তোমাদের জন্যে আফসোস! আল্লাহ প্রদত্ত পূর্ণ ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদের জন্যে বড়ই উত্তম, কিন্তু ওটা একমাত্র ধর্মশীলগণই পেয়ে থাকে।

হযরত ইমাম আহমাদ (রঃ) ও পূর্ব যুগীয় মনীষীদের একটি দল যাদু বিদ্যা শিক্ষার্থীকে কাফির বলেছেন। কেউ কেউ কাফির তো বলেন না, কিন্তু বলেন যে, যাদুকরকে হত্যা করাই হচ্ছে তার উপযুক্ত শাস্তি। হযরত বাজালাহ বিন উবাইদ (রঃ) বলেনঃ হযরত উমার (রাঃ) তাঁর এক নির্দেশ নামায় লিখেছিলেনঃ যাদুকর পুরুষ বা স্ত্রীকে তোমরা হত্যা করে দাও।' এ নির্দেশ অনুযায়ী আমরা তিনজন যাদুকরের গর্দান উড়িয়েছি।'

সহীহ বুখারী শরীফে আছে যে, উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসার (রাঃ) উপর তার দাসী যাদু করেছিল বলে তাকে হত্যা করা হয়। হযরত ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রঃ) বলেন যে, তিনজন সাহাবী (রাঃ) হতে যাদুকরকে হত্যা করার ফতওয়া রয়েছে। জামে' উত তিরমিযীর মধ্যে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ যাদুকরের শাস্তি হচ্ছে তরবারি দ্বারা হত্যা করা।' এ হাদীসের একজন বর্ণনাকারী ইসমাঈল বিন মুসলিম দুর্বল। সঠিক কথা এটাই মনে হচ্ছে যে, এ হাদীসটি মাওকুফ। কিন্তু তাবরানীর হাদীসের মধ্যে অন্য সনদেও এ হাদীসটি মার' রূপে বর্ণিত আছে। আল্লাহই সবচেয়ে বেশী জানেন। '

ওয়ালীদ বিন উকবার নিকট একজন যাদুকর ছিল, সে তার যাদু কার্য বাদশাহকে দেখাতো। সে প্রকাশ্যভাবে একটি লোকের মাথা কেটে নিতো। অতঃপর একটা শব্দ করতো, আর তখনই মাথা জোড়া লেগে যেতো মুহাজির সাহাবাগণের (রাঃ) মধ্যে একজন মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবী (রাঃ) ওটা দেখেন এবং পরের দিন তরবারি নিয়ে আসেন। যাদুকর খেলা আরম্ভ করার সাথে সাথেই তিনি স্বয়ং যাদুকরেরই মাথা কেটে ফেলেন এবং বলেনঃ "তুমি সত্যবাদী হলে নিজেই জীবিত হয়ে যাও।' অতঃপর তিনি কুরআন মাজীদের নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেনঃ "তোমরা যাদুর নিকট যাচ্ছ ও তা দেখছো?' ঐ সাহাবী (রাঃ) ওয়ালীদের নিকট হতে তাকে হত্যা করার অনুমতি নেননি বলে বাদশাহ তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হন এবং শেষে তাকে ছেড়ে দেন।

ইমাম শাফিঈ (রঃ) হযরত উমারের (রাঃ) নির্দেশ ও হযরত হাফসার (রাঃ) ঘটনা সম্পর্কে বলেছেন যে, ঐ হুকুম ঐ সময় কার্যকরী হবে যখন যাদুর মধ্যে শিরক যুক্ত শব্দ থাকবে।

মু'তাযিলা সম্প্রদায় যাদুর অস্তিত্বই মানে না। তারা বলে যে,যারা যাদুর অস্তিত্ব স্বীকার করে তারা কাফির। কিন্তু আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত যাদুর অস্তিত্বে বিশ্বাসী। তারা স্বীকার করে যে, যাদুকর তার যাদুর বলে বাতাসে উড়তে পারে, মানুষকে বাহ্যতঃ গাধা ও গাধাকে বাহ্যতঃ মানুষ করে ফেলতে পারে; কিন্তু নির্দিষ্ট কথাগুলো মন্ত্রতন্ত্র পড়ার সময় ঐগুলো সৃষ্টিকারী হচ্ছেন আল্লাহ তাআলা। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত আকাশকে ও তারকাকে ফলাফল সৃষ্টিকারী মানে না। দার্শনিকেরা, জোতির্বিদেরা এবং বে-দ্বীনেরা তো তারকা ও আকাশকেই ফলাফল সৃষ্টিকারী মেনে থাকে।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের প্রথম দলীল হচ্ছে নিম্নের আয়াতটিঃ তারা কোন ক্ষতি করতে পারবে না। দ্বিতীয় দলীল হচ্ছে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর যাদু করা। তৃতীয় দলীল হচ্ছে ঐ স্ত্রী লোকটির ঘটনা যা হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। আরও এ ধরনের বহু ঘটনা রয়েছে।

ইমাম রাযী (রঃ) বলেন যে, যাদু বিদ্যা লাভ করা দুষনীয় নয়। মাসয়ালা বিশ্লেষণকারীগণের এটাই অভিমত। কেননা, এটাও একটা বিদ্যা। আর আল্লাহ তাআলা বলেছেনঃ যারা জানে এবং যারা জানে না, এরা কি সমান? আর এ জন্যেও যাদু বিদ্যা শিক্ষা দুষণীয় নয় যে, তার দ্বারা মু'জিযা ও যাদুর মধ্যে পূর্ণভাবে পার্থক্য করা যায় এবং মু'জিযার জ্ঞান ওয়াজিব ও ওটা নির্ভর করে যাদু বিদ্যার উপর, যার দ্বারা পার্থক্য বুঝা যায়। সুতরাং যাদু বিদ্যা শিক্ষা করাও ওয়াজিব হয়ে গেল। ইমাম রাযীর (রাঃ) একথা"গোড়া হতে আগা পর্যন্ত ভুল। বিবেক হিসেবে যদি তিনি ওটাকে খারাপ না বলেন তবে মু'তাযিলা সম্প্রদায় বিদ্যমান রয়েছে, যারা ওকে বিবেক হিসেবেও খারাপ বলে থাকে। আর যদি শরীয়তের দিক দিয়ে খারাপ না বলেন তবে কুরআন মাজীদের এ শারঈ আয়াত ওকে খারাপ বলার জন্যে যথেষ্ট। সহীহ হাদীসে রয়ছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "যে ব্যক্তি কোন যাদুকর বা গণকের নিকট গমন করে সে কাফির হয়ে যায়। সুতরাং ইমাম রাযীর (র) উক্তি সম্পূর্ণ ভুল। তাঁর একথা বলা যে, মুহাককিকগণের অভিমত এটাই' এটাও ঠিক নয়।

মুহাকিকগণের এরূপ কথা কোথায় আছে? ইসলামের ইমামগণের মধ্যে কে এ কথা বলেছেন? অতঃপর যারা জানে এবং জানে না, তারা কি সমান?' এ আয়াতটিকে দলীলরূপে পেশ করা হঠধমী ছাড়া কিছুই নয়। কেননা, এ আয়াতের 'ইলম এর ভাবার্থ হচ্ছে ধর্মীয় 'ইলম। এ আয়াতে শারঈ

আলেমগণের মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর তার এ কথা বলা যে, এর দ্বারা মু'জিযার 'ইলম লাভ হয়, এটা একেবারে বাজে কথা। কেননা, আমাদের রাসূল (সঃ)-এর সবচেয়ে বড় মু'জিযা হচ্ছে পবিত্র কুরআন, যা বাতিল থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। কিন্তু তার মু'জিযা জানা যাদু জানার উপর নির্ভরশীল নয়। ঐ সব লোক যাদের যাদুর সঙ্গে দূরের সম্পর্ক নেই তারাও এটাকে মু'জিযা বলে স্বীকার করেছেন। সাহাবীগণ (রাঃ), তাবেঈগণ, ইমামগণ এমনকি সাধারণ মুসলমানগণও একে মু'জিযা মেনে থাকেন। অথচ তাদের মধ্যে কেউ কখনও যাদু জানা তো দূরের কথা, ওর কাছেই যাননি। তাঁরা ওটা নিজে শিক্ষা করেননি এবং অপরকেও শিক্ষা দেননি। তাঁরা যাদু করেননি এবং করাননি। বরং এসব কাজকে তারা কুফরই বলে এসেছেন। অতঃপর এ দাবী করা যে, মু'জিযা জানা ওয়াজিব এবং যাদু ও মুজিযার মধ্যে পার্থক্য যাদুর উপর নির্ভর করে, সুতরাং যাদু শিখাও ওয়াজিব হলো, এটা কতই না অর্থহীন দাবী! যাদু বিভিন্ন প্রকারের রয়েছে, যা আবু আব্দিল্লাহ রাফী বর্ণনা করেছেন।

(১) প্রথম যাদু হচ্ছে তারকা পূজকদের। তারা সাতটি গতিশীল তারকার উপর বিশ্বাস রাখে যে, ভাল-মন্দ ওদের কারণেই হয়ে থাকে। এ জন্যে তারা কতকগুলো নির্দিষ্ট শব্দ পাঠ করতঃ ওদের পূজা করে থাকে। এ সম্প্রদায়ের মধ্যেই হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আগমন করেন এবং হিদায়াত করেন। ইমাম রাযী (রঃ) এ বিষয়ের উপর একটি বিশিষ্ট পুস্তক রচনা করেছেন এবং ওর নাম اَلسِّرُّ الْمَكْتُوْبُ فِىْ مَخَاطِبَةِ الشَمْسِ وَالنُّجُوْمِ وَالسَّاعَةِ রেখেছেন। কেউ কেউ বলেন যে, পরে তিনি ওটা হতে তাওবা করেছেন।

আবার কেউ কেউ বলেন যে, তিনি শুধু জানাবার জন্যে এবং তার এই বিদ্যা প্রকাশ করার জন্যেই এ পুস্তক লিখেছেন, এর প্রতি তাঁর বিশ্বাস নেই। কেননা এটা সরাসরি কুফরী।

(২) দ্বিতীয় যাদু হচ্ছে ধারণা শক্তির উপর বিশ্বাসী লোকদের যাদু। ধারণা ও খেয়ালের বড় রকমের প্রভাব রয়েছে। যেমন একটি সংকীর্ণ সাঁকো মাটির উপর রেখে দিলে মানুষ অনায়াসেই তার উপর দিয়ে চলতে পারে। কিন্তু এই সংকীর্ণ সঁকোটি যদি নদীর উপর হয় তবে মানুষ আর তার উপর দিয়ে চলতে পারে না। কেননা ধারণা হয় যে, এখনই পড়ে যাবে। ধারণার এই দুর্বলতার কারণেই যেটুকু জায়গার উপর দিয়ে মাটিতে চলতে পারছিল, ঐ জায়গার উপর দিয়েই এরকম ভয়ের সময় চলতে পারে না। এ জন্যেই হেকিমগণ ও ডাক্তারগণ ভীত লোককে লাল জিনিস দেখা হতে বিরত রাখেন এবং মৃগী রোগে আক্রান্ত লোককে খুব বেশী আলোকময় ও দ্রুত গতিসম্প দেখতে নিষেধ করে থাকেন। এর দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, উপর ধারণার একটা বিশেষ প্রভাব পড়ে থাকে। জ্ঞানীগণ এ বিষয়েও একমত যে, ন্যর' লেগে থাকে। সহীহ হাদীসেও এসেছে যে, নযর' লাগা সত্য। ভাগ্যের উপর যদি কোন জিনিস প্রাধান্য লাভকারী হতো তবে তা ন্যই ইতো। এখন যদি নাফস্ শক্ত হয় তবে বাহ্যিক সাহায্য ও বাহ্যিক কার্যের কোন প্রয়োজন নেই। আর যদি নাফস ততো শক্ত না হয় তবে ঐ সব যন্ত্রেরও প্রয়োজন হয়। নাফসের যে পরিমাণ শক্তি বেড়ে যাবে সেই পরিমাণ আধ্যাত্মিক শক্তি বেড়ে যাবে এবং প্রভাবও বৃদ্ধি পাবে। আর যে পরিমাণ এ শক্তি কম হবে সে পরিমাণ আধ্যাত্মিক শক্তিও কমে যাবে।

এ শক্তি কখনও কখনও খাদ্যের স্বল্পতা এবং জনগণের মেলামেশা ত্যাগ করার মাধ্যমেও লাভ হয়ে থাকে। কখনও তো মানুষ এ শক্তির দ্বারা শরীয়ত। অনুযায়ী পুণ্যের কাজ করে থাকে। শরীয়তের

পরিভাষায় একে 'কারামত' বলে, যাদু বলে না। আবার কখনও কখনও মানুষ এ শক্তি দ্বারা বাতিল ও শরীয়ত পরিপন্থী কাজ করে থাকে এবং দ্বীন হতে বহু দূরে সরে পড়ে। এ রকম লোকের ঐ অলৌকিক কার্যাবলী দেখে প্রতারিত হয়ে তাকে ওয়ালী বলা কারও উচিত নয়। কেননা, যারা শরীয়তের উল্টো কাজ করে তারা কখনও আল্লাহর ওয়ালী হতে পারে না। তা নাহলে সহীহ হাদীস সমূহে দাজ্জালদেরকে অভিশপ্ত ও দুষ্ট বলা হতো না। অথচ তারা তো বহু অলৌকিক কাজ করে দেখাবে।

(৩) তৃতীয় যাদু হচ্ছে জ্বীন প্রভৃতি পার্থিব আত্মসমূহের দ্বারা সহায্য প্রার্থনা করা। দার্শনিকরা ও মুতাযেলীরা এটা স্বীকার করে না। কতগুলো লোক এসব পার্থিব আত্মার মাধ্যমে কতকগুলো শব্দ ও কার্যের দ্বারা সম্পর্ক সৃষ্টি করে থাকে। ওকে মোহমন্ত্র ও প্রেতাত্মার যাদুও বলা হয়।

(৪) চতুর্থ প্রকারের যাদু হচ্ছে ধারণা বদলিয়ে দেয়া, নযরবন্দ করা এবং প্রতারিত করা,যার ফলে প্রকৃত নিয়মের উল্টো কিছু দেখা যায়। কলাকৌশলের মাধ্যমে কার্য প্রদর্শনকারীকে দেখা যায় যে, সে প্রথমে একটা কাজ আরম্ভ করে, যখন মানুষ একাগ্র চিত্তে ওর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং তার প্রতি সম্পূর্ণ নিমগ্ন হয়ে যায়, তখন তড়িৎ করে সে আর একটি কাজ আরম্ভ করে দেয়, যা মানুষের দৃষ্টির অন্তরালে থেকে যায়। তা দেখে তারা তখন হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। ফিরআউনের যাদুকরদের যাদু এ প্রকারেরই ছিল। এ জন্যেই কুরআন পাকে রয়েছেঃ "তারা মানুষের চোখে যাদু করে দেয় এবং তাদের অন্তরে ভয় বসিয়ে দেয়। অন্য স্থানে রয়েছেঃ মূসার (আঃ) মনে এ ধারণা দেয়া হচ্ছে যে, ঐ সব লাঠি ও দড়ি যেন সাপ হয়ে চলাফেরা করছে। অথচ এরূপ ছিল না। আল্লাহই সবচেয়ে বেশী জানেন।

(৫) পঞ্চম প্রকারের যাদু হচ্ছে কয়েকটি জিনিসের সংমিশ্রণে একটি জিনিস তৈরী করা এবং এর দ্বারা আশ্চর্যজনক কাজ নেয়া। যেমন, ঘোড়ার আকৃতি তৈরী করে দিল। ওর উপর একজন কৃত্রিম আরোহী বসিয়ে দিল যার হাতে বাদ্য যন্ত্র রয়েছে। এক ঘন্টা অতিবাহিত হতেই ওর মধ্য হতে শব্দ বের হতে লাগল। অথচ কেউই ওকে বাজাচ্ছে না। এরূপভাবেই এমন নিপুণতার সাথে মানুষের ছবি বানালো যে, মনে হচ্ছে যেন প্রকৃত মানুষই হাসছে বা কাঁদছে। ফিরআউনের যাদুকরদের যাদুও এই প্রকারেরই ছিল। তাদের কৃত্রিম সাপগুলো পারদ জাতীয় দ্রব্য দিয়ে তৈরী ছিল বলে মনে হতো যেন জীবিত সাপ নড়াচড়া করছে। ঘড়ি, ঘন্টা এবং ছোট ছোট জিনিস, যা থেকে বড় বড় জিনিস বেরিয়ে আসে, এসবগুলোই এই প্রকারেরই অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃতপক্ষে একে যাদু বলা উচিত নয়। কেননা, এটা তো এক প্রকার নির্মাণ ও কারিগরি, যার কারণগুলো সম্পূর্ণ প্রকাশ্য। যে ওটা জানে সে এসব শব্দ দ্বারা একাজ করতে পারে। যে ফন্দি বাইতুল মুকাদ্দাসের খৃষ্টানেরা করতো ওটাও এ শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত। ঐ ফন্দি এই যে, তারা গোপনে গির্জার প্রদীপগুলি জ্বালিয়ে দিতো। অতঃপর ওকে গির্জার মাহাত্ম্য বলে প্রচার করতঃ জনগণকে তাদের ধর্মে টেনে আনতো।

কতক কারামিয়াহ ও সুফিয়্যাহ সম্প্রদায়েরও ধারণা এই যে, জনগণকে আল্লাহর ইবাদতের দিকে আকৃষ্ট করার জন্যে আগ্রহ ও উৎসাহ প্রদর্শনের হাদীসগুলো বানিয়ে নিলে কোন দোষ নেই। কিন্তু এটা চরম ভুল। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি জেনে শুনে আমার নামে মিথ্যা কথা বলে সে যেন দোযখে তার স্থান ঠিক করে নেয়।' তিনি আরও বলেনঃ 'আমার হাদীসগুলো তোমরা বর্ণনা

করতে থাকো; কিন্তু আমার নামে মিথ্যা কথা বলো না। যে ব্যক্তি আমার নামে মিথ্যা কথা বলে সে নিঃসন্দেহে জাহান্নামী।'

একজন খ্রীষ্টান পাদরী একদা দেখে যে, পাখীর একটি ছোট বাচ্চা যা উড়তে পারে না, একটি বাসায় বসে আছে। যখন ওটা দুর্বল ও ক্ষীণ স্বর বের করছে তখন অন্যান্য পাখীরা ওর প্রতি দয়া পরবশ হয়ে যাইতুন ফল এনে ওর বাসায় রেখে দিচ্ছে। ঐ পাদরী কোন জিনিস দিয়ে ঐ আকারেরই একটি পাখী তৈরী করে। ওর নীচের দিক ফাপা রাখে এবং ওর ঠোটের দিকে একটি ছিদ্র রাখে, যার মধ্য দিয়ে বাতাস ভিতরে প্রবেশ করে। অতঃপর যখন বাতাস বের হয় তখন ঐ পাখীর মতই শব্দ করে। ওটা নিয়ে গিয়ে সে গির্জার মধ্যে বাতাস মুখো রেখে দেয়। ছাদে একটি ছোট ছিদ্র করে দেয় যেন বাতাস সেখান দিয়ে যাতায়াত করে। এখন যখনই বাতাস বইতে থাকে তখনই ওটা হতে শব্দ বের হতে থাকে। আর এ শব্দ শুনে ঐ প্রকারের পাখী তথায় একত্রিত হয় এবং যাইতুন' ফল এনে এনে রেখে যায়। ঐ পাদরী তখন প্রচার করতে শুরু করে যে, গির্জার মধ্যে এটা এক অলৌকিক ব্যাপার। এখানে একজন মনীষীর সমাধি রয়েছে এবং এটা তাঁরই কারামত। এখন জনগণ স্বচক্ষে এটা দেখে বিশ্বাস করে নেয়। অতঃপর তারা ঐ কবরের উপর ন্যর-নিয়ায আনতে থাকে এবং এই কারামত বহু দূর পর্যন্ত পৌঁছে যায়। অথচ ওটা না ছিল কারামত, না ছিল মু'জিযা। বরং শুধুমাত্র ছিল ওটা একটা গোপনীয় বিষয় যা সেই পাদরী; একমাত্র তার পেট পূরণের জন্যেই গোপনীয়ভাবে করে রেখেছিল। আর ঐ অভিশপ্ত দল ওতেই লিপ্ত হয়ে পড়েছিল।

(৬) যাদুর ষষ্ঠ প্রকার হচ্ছে কতকগুলো ওষুধের গোপন কোন বৈশিষ্ঠ্য জেনে ওটা কাজে লাগানো। আর এটা তো স্পষ্ট কথা যে, এতে বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য: রয়েছে। চুম্বককেই তো দেখা যায় যে, ওটা কিভাবে লোহাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে থাকে। অধিকাংশ সূফী ও দরবেশই ঐ ফন্দি ফিকিরকেই জনগণেরই মধ্যে কারামত রূপে প্রদর্শন করতঃ তাদেরকে মুরীদ করতে থাকে।

(৭) সপ্তম প্রকারের যাদু হচ্ছে কারও মধ্যে একটা বিশেষ প্রভাব ফেলে যা চায় তাই তার দ্বারা করিয়ে নেয়া। যেমন তাকে বলে যে, তার "ইসমে আযম . মনে আছে কিংবা জ্বিনেরা তার তাবে আছে। এখন যদি তার সামনে লোকটি দুর্বল ঈমানের লোক হয় এবং অশিক্ষিত হয় তবে তো সে তাকে বিশ্বাস করে নেবে এবং তার প্রতি তার একটা ভয় ও সম্ভ্রম থাকবে যা তাকে আরও দুর্বল করে দেবে। এখন সে যা চাইবে তাই সে করবে। আর এই প্রভাব সাধারণতঃ স্বল্প জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তির উপরই পড়ে থাকে। একেই মুতাবান্নাহ' বলা হয়। আর অন্তদৃষ্টি দিয়ে সে জ্ঞানী ও অজ্ঞানকে চিনতে পারে, কাজেই সে নিরেটের উপরই তার ক্রিয়া চাপিয়ে থাকে।

(৮) অষ্টম প্রকারের যাদু হচ্ছে চুগলী করা। সত্য-মিথ্যা মিশিয়ে কারও অন্তরে নিজের কর্তৃত্ব স্থাপন করা এবং গোপনীয় চতুরতা দ্বারা তাকে বশীভূত করা। এ চুগলী যদি মানুষের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টির জন্যে হয় তবে এটা শরীয়ত অনুযায়ী হারাম হবে। আর যদি এটা সংশোধন করার উদ্দেশ্যে হয় এবং মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক মিলনের জন্যে হয় কিংবা এর ফলে যদি মুসলমানদেরকে তাদের প্রতি আগত বিপদ থেকে রক্ষা করা যায় এবং কাফিরদের শক্তি নষ্ট করতঃ তাদের মধ্যে আতংক সৃষ্টি করা যায় তবে এটা বৈধ হবে। যেমন হাদীস শরীফে আছে যে, ঐ ব্যক্তি মিথ্যাবাদী নয় যে মঙ্গলের জন্যে এদিক ওদিক কথা নিয়ে যায়। হাদীসে আরও আছে যে, যুদ্ধ হচ্ছে প্রতারণার

নাম। হযরত নঈম বিন মাসউদ (রাঃ) খন্দকের যুদ্ধে আরবের কাফির ও ইয়াহূদীদের মধ্যে এদিক ওদিকের কথার মাধ্যমে বিচ্ছেদ আনয়ন করেছিলেন এবং এরই ফলে মুসলমানদের নিকট তাদের পরাজয় ঘটেছিল। এটা অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তির কাজ।

এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, ইমাম রাযী যে যাদুর এই আটটি প্রকার বর্ণনা ; করেছেন তা শুধু শব্দ হিসেবে। কেননা আরবী ভাষায় سِحْر বা যাদু প্রত্যেক ঐ জিনিসকে বলা হয়, যা অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও জটিল হয় এবং যার কারণসমূহ মানুষের দৃষ্টির অন্তরালে থাকে। এজন্যেই একটি হাদীসে আছে যে, কোন কোন বর্ণনাও যাদু। আর এ কারণেই সকালের প্রথম ভাগকে 'সহুর' বলা হয়। কেননা, ওটা মানুষের চক্ষুর অন্তরালে থাকে। আর ঐ শিরাকের 'সিহর' বলে যা আহার্যের স্থানে থাকে। আবু জেহেলও বদরের যুদ্ধে বলেছিল যে, তার খাদ্যের শিরা ভয়ে ফুলে গেছে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ আমার সিহর' ও 'নাহারের মাঝে রাসূলুল্লাহ (সঃ) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাহলে সিহূরের অর্থ হচ্ছে খাদ্যের শিরা এবং নাহারের অর্থ হচ্ছে বুক। কুরআন পাকে আছেঃ "তারা (যাদুকরেরা) মানুষের চক্ষু থেকে তাদের কার্যাবলী গোপন রেখেছিল। আবু আবদুল্লাহ কুরতুবী (রঃ) বলেনঃ "আমরা বলি যে, যাদু আছে এবং এও বিশ্বাস করি যে, আল্লাহকে মঞ্জর হলে তিনি যাদুর সময় যা চান তাই ঘটিয়ে থাকেন। যদিও মুতাযিলা, আবু ইসহাক ইসফিরাঈনী এবং ইমাম শফিঈ (রঃ) এটা বিশ্বাস করেন না।' যাদু কখনও হাতের চালাকি দ্বারাও হয়ে থাকে আবার কখনও ভোরা, সুতা ইত্যাদির মাধ্যমেও হয়ে থাকে। কখনও আল্লাহর নাম পড়ে ফু দিলেও একটা বিশেষ প্রভাব পড়ে থাকে। কখনও শয়তানের নাম নিয়ে শয়তানী কার্যাবলী দ্বারাও লোক যাদু করে থাকে। কখনও ঔষধ ইত্যাদি দ্বারাও যাদু করা হয়।"রাসূলুল্লাহ (সঃ) যে বলেছেনঃ কতকগুলো বর্ণনাও যাদু' এর দুটোই ভাবার্থ হতে পারে। হয়তো তিনি এটা বর্ণনাকারীর প্রশংসার জন্যে বলেছেন, কিংবা তার নিন্দে করেও বলে থাকতে পারেন যে, সে তার মিথ্যা কথাকে এমন ভঙ্গিমায় বর্ণনা করছে যে, তা সত্য মনে হচ্ছে।

মন্ত্রী আবুল মুযাফফর ইয়াহইয়া বিন মুহাম্মদ বিন হাবীর (রঃ) স্বীয় গ্রন্থ 'আল আশরাফু আ'লা মাযাহিবিল আশরাফে' এর মধ্যে যাদু অধ্যায়ে লিখেছেনঃ এ বিষয়ে ইজমা রয়েছে যে, যাদুর অস্তিত্ব আছে। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (রঃ) এটা স্বীকার করেননি। যারা যাদু শিক্ষা করে ও ওটা ব্যবহার করে তাদেরকে ইমাম আবু হানীফা (রঃ) ইমাম মালিক (রঃ), এবং ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (র) কাফির বলেছেন। ইমাম আবু হানীফার (রঃ) কয়েকজন শিষ্যের মতে যাদু যদি আত্মরক্ষার জন্যে কেউ শিক্ষা করে তবে সে কাফির হবে না। তবে হ, যারা ওর প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং ওকে উপকারী মনে করে সে কাফির। অনুরূপ ভাবে যারা ধারণা করে যে, শয়তানরা এ কাজ করে থাকে এবং তারা এরকম ক্ষমতা রাখে, তারাও কাফির।

ইমাম শাফিঈ (রঃ) বলেন যে, যাদুকরদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, যদি তারা বাবেলবাসীদের মত বিশ্বস রাখে এবং সাততি গতিশীল তারকাকে প্রভাব সৃষ্টিকারীরূপে বিশ্বাস করে তবে তারা কাফির। আর যদি এ না হয়, কিন্তু যাদুকে বৈধ মনে করে তবে তারাও কাফির। ইমাম মালিক (রঃ) ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের (রঃ) অভিমত এও আছে যে, যারা যাদু করে এবং ওকে ব্যবহারে লাগায় তাদেরকে হত্যা করে দেয়া হবে। ইমাম আবু হানীফা (রঃ) এবং ইমাম শাফিঈ (রঃ) বলেন যে, যে

পর্যন্ত বারবার না করে কিংবা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি সম্বন্ধে নিজে স্বীকার না করে সেই পর্যন্ত হত্যা করা হবে না।

তিনজন ইমামই বলেন যে, তার হত্যা হচ্ছে শাস্তির জন্যে। কিন্তু ইমাম শাফিঈ (রঃ) বলেন যে, এ হত্যা হচ্ছে প্রতিশোধের জন্য। ইমাম মালিক (রঃ), ইমাম আবু হানীফা (রঃ) এবং ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের (রঃ) একটি প্রসিদ্ধ উক্তিতে এ নির্দেশ আছে যে, যাদুকরকে তাওবাও করানো হবে না এবং তার তাওবা করার ফলে তার শাস্তি লোপ পাবে না।

ইমাম শাফিঈর (রঃ) মতে তার তাওবা গৃহীত হবে। একটি বর্ণনায় ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলেরও (রঃ) এ উক্তি আছে। ইমাম আবু হানীফার (রঃ) মতে কিতাবীদের যাদুকরকেও হত্যা করা হবে। কিন্তু অন্যান্য তিনজন ইমামের অভিমত এর উল্টো। লাবীদ বিন আসাম নামক ইয়াহুদী রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর যাদু করেছিল, কিন্তু তাকে হত্যা করা হয়নি। যদি কোন মুসলমান মহিলা যাদু করে তবে তার সম্বন্ধে ইমাম আবু হানীফার (রঃ) মত এই যে, তাকে বন্দী করা হবে। আর অন্যান্য তিনজন ইমামের মতে পুরুষের মত তাকেও হত্যা করা হবে। আল্লাহ তাআলাই এ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী জ্ঞান রাখেন।

হযরত যুহরীর (রঃ) মতে মুসলমান যাদুকরকে হত্যা করা হবে,কিন্তু মুশরিক যাদুকরকে হত্যা করা হবে না। ইমাম মালিক (রঃ) বলেন যে, যদি কোন যিম্মীর যাদুর ফলে কেউ মারা যায় তবে যিম্মীকেও মেরে ফেলা হবে। তিনি এটাও বর্ণনা করেন যে, তাকে প্রথমে তাওবা করতে বলা হবে। যদি সে তাওবা করতঃ ইসলাম গ্রহণ করে তবে তা ভালই, নচেৎ তাকে হত্যা করা হবে। আবার তার হতে এও বর্ণিত আছে যে, ইসলাম গ্রহণ করলেও তাকে হত্যা করা হবে।

যে যাদুকরের যাদুতে শিরকী শব্দ আছে, চারজন ইমামই তাকে কাফির বলেছেন। ইমাম মালিক (রঃ) বলেন যে, যাদুকরের উপর প্রভুত্ব লাভ করার পর যদি সে তাওবা করে তবে তার তাওবা গৃহীত হবে না। যেমন যিন্দীক সম্প্রদায়। তবে যদি তার উপর প্রভুত্ব লাভের পূর্বেই তারা তাওবা করে তা হলে হবে। আর যদি তার যাদুতে কেউ মারা যায় তবে তো তাকে হত্যা করা হবেই। ইমাম শাফিঈ (রঃ) বলেন যে, যদি সে বলেঃ আমি মেরে ফেলার জন্যে যাদু করিনি। তবে ভুল করে হত্যার অপরাধে তার নিকট হতে জরিমানা আদায় করা হবে। হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব (রঃ) যাদুকরের দ্বারা যাদু উঠিয়ে নিতে অনুমতি দিয়েছেন, যেমন সহীহ বুখারীর মধ্যে রয়েছে। হযরত আমের শা'বীও এটাকে কোন দোষ মনে করেন না। কিন্তু খাজা হাসান বসরী (রঃ) এটাকে মাকরূহ বলেছেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে আরয করেনঃ "আপনি যাদু তুলিয়ে নেন না কেন? তিনি বলেনঃ "আল্লাহ তা'আলা তো আমাকে আরোগ্য দান করেছেন। আমি লোকের উপর মন্দ খুলিয়ে নিতে ভয় করি।'

যাদুর চিকিৎসা

হযরত অহাব (রঃ) বলেন যে, কুলের সাতটি পাতা পাটায় বেটে পানিতে মিশাতে হবে। অতঃপর আয়াতুল কুরসী পড়ে ওর উপর ফু দিতে হবে এবং যাদুকৃত ব্যক্তিকে তিন ঢাকে পানি পান করাতে

হবে এবং অবশিষ্ট পানি দিয়ে গোসল করাতে হবে। ইনশাআল্লাহ্ যাদুর ক্রিয়া নষ্ট হয়ে যাবে। এ আমল বিশেষভাবে ঐ ব্যক্তির জন্যে খুবই মঙ্গলজনক যাকে তার স্ত্রী থেকে বিরত রাখা হয়েছে। যাদু ক্রিয়া নষ্ট করার সবচেয়ে বড় চিকিৎসা হচ্ছে قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ও قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ এ সূরাগুলো। হাদীস শরীফে আছে যে, এই সূরাগুলোর চেয়ে বড় রক্ষাকবচ আর কিছু নেই। এরকমই আয়াতুল কুরসীও শয়তানকে দূর করার জন্য বড়ই ফলদায়ক।

(তাফসিরে ইবনে কাসির)

যে মনে করে যে, তার যাদু আল্লাহ্‌র অনুমতি ও ইচ্ছা বিনা উপকার ও অনিষ্ট সাধন করতে পারে সে অবিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

৩। রাশিফল ও জ্যেতিষের শিরকঃ রাশিফল বলতে বুঝায় কল্পিত রাশিচক্রে গ্রহ-নৰত্রের অবস্থানের প্রভাবে ভূ-ম-লে সৃষ্ট প্রতিক্রিয়া বা ঘটনাসমূহের আগাম ভবিষ্যত বানী দেয়াকে। এটা জ্যেতিষবিদ্যা নামে অভিহিত এবং যারা এ বিদ্যায় পারদর্শী তারা জ্যেতিষী নামে পরিচিত। জ্যেতিষীর শির্ক বলতে রাশি-নৰত্রের সাহায্যে ভূম-লে ঘটিতব্য ঘটনাঘটন সমূহের আগাম ভবিষ্যদ্বাণী করাকে বুঝান হয়। যেমনঃ গ্রহ-ণৰত্রের গতি-বিধি ও অবস্থান পর্যবেৰণ করে বৃষ্টিপাত ও ঝড়-বন্যা সহ নানা প্রাকৃতিক ঘটনা ও দুর্যোগের আগাম সংবাদ দেওয়া। জ্যেতিষীরা বিশ্বাস করে যে, পৃথিবীতে সকল প্রাকৃতিক ঘটনাই তারকারাজীর প্রভাবে সংঘটিত হয়ে থাকে। যেমনঃ বৃষ্টিপাত, বন্যা, শীত, গরম, মহামারী বা যে কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয় ইত্যাদি সব কিছুই তারকার প্রভাবে ঘটে থাকে। তাই জ্যেতির্বিদগণ এ সম্পর্কে অগ্রিম বার্তা প্রদান করতে সৰম। কিন্তু একজন তাওহীদবাদী মুসলিম জ্যেতিষে বিশ্বাস করে না। বস্তুতঃ রাশিফলের কোন ভিত্তিও নেই।

আল্লাহ্‌র সাথে অন্যকে জুড়ে নিয়ে কথা বলার শির্ক আমাদের সমাজে এমন কিছু কথার প্রচলন দেখা যায় যেখানে আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন সত্তার নাম জুড়ে কোন বিষয় উপস্থাপন করা হয়। যেমন- “আল্লাহ্ এবং আপনি না হলে আমার সবই ধ্বংস হয়ে যেত” আবার কেমন আছেন? প্রশ্ন করলে এর উত্তরে প্রায়শঃই মানুষকে এরূপ বলতে শোনা যায় “আল্লাাহ্ এবং আপনি যেমন চেয়েছেন” ইত্যাদি। উল্লিখিত বাক্য দু’টোতে আল্লাহ্‌র সাথে অন্যকে অংশী স্থাপন করা হয়েছে, সুতরাং এ ধরনের কথা-বার্তা শিরক। এখানে ‘এবং’ শব্দটির মধ্যে সমকক্ষতার গন্ধ আছে। তবে ‘এবং’ এর পরিবর্তে যদি অন্য শব্দ ব্যাবহার করা যায়, যেমন ‘অতঃপর’, ‘এরপর’ ইত্যাদি, তাহলে এ শির্ক থেকে মুক্ত থাকা যায়। যেমন “আল্লাহ্ অতঃপর আপনি যেমন চেয়েছেন” এখানে ‘এবং’ এর যায়গায় ‘অতঃপর’ শব্দটি ব্যাবহারের ফলে এর দ্বারা সমকক্ষতা প্রকাশ পায় না। তবে সবথেকে নিরাপদ হচ্ছে এই যে, কারো নাম না জড়িয়ে এভাবে বলা যে, ‘আল্লাহ্ একাই যা চান’। এ সম্পর্কে একটি হাদিস উপস্থাপন করা

যায়। সহীহ্ হাদিসে বর্নিত আছে, একব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাললাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলল, “যা আল্লাহ্ চান ও রাসূলুল্লাহ (সাললাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চান।” তিনি বললেন, “তুমি কি আমাকে আল্লাহ্র অংশীদার করছ? একথা বল-যা আল্লাহ্ একাই চান।” তফসীর ইবনে কাসীর, ১ম খন্ড-পৃষ্ঠা ১৮৮,১৮৯

মুসলিমদের মাঝে এ জাতীয় বাক্য ব্যবহারর আরো অনেক দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা যায়। যেমনঃ আমার জন্য শুধু আল্লাাহ্ এবং আপনি রয়েছেন। আমি আল্লাহ্ এবং রাসূলুল্লাহ (সাললাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) - এর উপর নির্ভর করি ।এটি আল্লাহ্ এবং আপনার বরকতেই হয়েছে। ঙআমি আলৰাহ্র নিকট এবং তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থণা করি। ঙ আমার জন্য উপরে আছেন আলৰাহ্ আর নিচে আছেন আপনি। উল্লিখিত বাক্যগুলিতে ‘এবং’ ও ‘আর’ শব্দ দু’টি সংযোগ স্থাপন কারী শব্দ রূপে ব্যবহৃত হয়ে আল্লাহ্র সাথে অন্যের শরীক স্থাপন কারী বাক্য হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। যেমন আগেই বলা হয়েছে যে, এ শব্দ দু’টোর পরিবর্তে যখন ‘অতঃপর’ বা ‘এরপর’ ব্যবহার করা হয় তখন সে ভয় থেকে রেহাই পাওয়া যায় এবং শির্ক থেকেও বাঁচা যায়। এর স্বপৰে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাললাম) বলেছেন, “যখন তোমাদের কেউ শপথ করে, সে যেন এমন না বলেঃ আল্লাহ্ যা চান এবং তুমি যা চাও, বরং সে যেন বলেঃ আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন, এরপর তুমি যা চাও।” হাদিস, ইবনে মাজাহ, নং ২১১৭ সুতরাং আমরা আমাদের দৈনন্দিন আচরণে ও কথা-বার্তায় এ ধরনের সুক্ষ্ম ভুল গুলোকে হাদিসের আলোকে শুধরে নেওয়ার প্রচেষ্টা করব আর একমাত্র আলৰাহ্র উপরে ভরসা করব এবং তাঁর নিকটেই সাহায্য কামনা করব।

(শিরক – ড. মোঃ সেলিম রেজা)

ছোট শির্কের আরও কিছু ভয়াবহতা

*মহান আল্লাহ বলেন-

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُبْطِلُوا۟ صَدَقَـٰتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُۥ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ
وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ۖ فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُۥ وَابِلٌ فَتَرَكَهُۥ صَلْدًا ۖ لَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَىْءٍ
مِّمَّا كَسَبُوا۟ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَـٰفِرِينَ ٢٦٤

হে ঈমানদারগণ! দানের কথা মনে করিয়ে দিয়ে ও কষ্ট দিয়ে তোমরা নিজেদের দান-খয়রাতকে সে ব্যক্তির ন্যায় ব্যর্থ করে দিও না যে নিজের ধন লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করে থাকে, অথচ সে

আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী নয়। তার তুলনা সেই মসৃণ পাথরের মত, যাতে সামান্য কিছু মাটি আছে, অতঃপর প্রবল বৃষ্টিপাত তাকে পরিষ্কার করে ফেলে। তারা স্বীয় কৃত কার্যের ফল কিছুই পাবে না; আল্লাহ কাফিরদেরকে পথপ্রদর্শন করেন না। (সুরা বাকারা, আয়াত-২৬৪)

আল্লাহ তাআলা তার ঐ বান্দাদের প্রশংসা করছেন যারা দান-খয়রাত করে থাকেন; অতঃপর যাদেরকে দান করেন তাদের নিকট নিজেদের কৃপার কথা প্রকাশ করে না এবং তাদের নিকট হতে কিছু উপকারেরও আশা করে না। তারা তাদের কথা ও কাজ দ্বারা দান গ্রহীতাদেরকে কোন প্রকারের কষ্টও দেয় না। মহান আল্লাহ তাঁর এই বান্দাদেরকে উত্তম প্রতিদান প্রদানের ওয়াদা করেছেন যে, তাদের প্রতিদান আল্লাহ তা'আলার দায়িত্বে রয়েছে। কিয়ামতের দিন তাদের ভয় ও চিন্তার কারণ থাকবে না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, মুখ দিয়ে উত্তম কথা বের করা, কোন মুসলমান ভাইয়ের জন্যে প্রার্থনা করা, দোষী ও অপরাধীদের ক্ষমা করে দেয়া ঐ দান-খয়রাত হতে উত্তম, যার পিছনে থাকে ক্লেশ ও কষ্ট প্রদান। ইবনে আবি হাতিমের বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "উত্তম কথা হতে ভাল দান আর কিছু নেই। তোমরা কি মহান আল্লাহর قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّ مَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَآ اَذًى অর্থাৎ যে দানের পশ্চাতে থাকে ক্লেশ দান সেই দান অপেক্ষা উত্তম বাক্য ও ক্ষমা উৎকৃষ্টতর' (২:২৬৩) এই ঘোষণা শুননি: আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাগণ হতে অমুখাপেক্ষী এবং সমস্ত সৃষ্টজীব তারই মুখাপেক্ষী। তিনি অত্যন্ত সহিষ্ণু। বান্দার পাপ দেখেও ক্ষমা করে থাকেন।

সহীহ মুসলিম শরীফে রয়েছে , রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তিন প্রকার লোকের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের প্রতি করুণার দৃষ্টিতে দেখবেন না ও তাদেরকে পবিত্র করবেন না। বরং তাদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। প্রথম হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে দান করার পর কৃপা প্রকাশ করে থাকে। দ্বিতীয় হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে পায়জামাকা লুঙ্গী পায়ের গোছার নীচে লটকিয়ে রাখে। তৃতীয় হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে মিথ্যা শপথ করে নিজের পণ্য দ্রব্য বিক্রি করে থাকে। সুনান-ই- ইবনে মাজাহ্ প্রভৃতি হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ বাপ-মার অবাধ্য, সাদকা করে কৃপা প্রকাশকারী, মদ্যপায়ী এবং তকদীরকে অবিশ্বাসকারী বেহেশতে প্রবেশ লাভ করবে না। সুনান-ই-নাসাঈর মধ্যে রয়েছে, রাসূলুয়াহ (সঃ) বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তিন ব্যক্তির দিকে দৃষ্টিপাতও করবেন না। পিতা-মাতার অবাধ্য, মদ্যপানে অভ্যস্ত এবং দান করে অনুগ্রহ প্রকাশকারী। নাসাঈর অন্য হাদীসে রয়েছে যে,ঐ তিন ব্যক্তি (প্রাগুক্ত তিন ব্যক্তি) বেহেশতে প্রবেশ করবে না, এই জন্যেই এই আয়াতেও ইরশাদ হচ্ছেঃ অনুগ্রহ প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে তোমাদের দান-খয়রাত নষ্ট করো না। এ অনুগ্রহ প্রকাশ ও কষ্ট দেয়ার পাপ দানের পুণ্য অবশিষ্ট রাখে না। অতঃপর অনুগ্রহ প্রকাশকারী ও কষ্ট প্রদানকারীর সাদকা নষ্ট হয়ে যাওয়ার উপমা ঐ সাদকার সাথে দেয়া হয়েছে, যা মানুষকে দেখাবার জন্যে দেয়া হয় এবং উদ্দেশ্য থাকে যে, মানুষ তাকে দানশীল উপাধিতে ভূষিত করবে ও দেশে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে। আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য তার মোটেই থাকে না এবং সে পুণ্য লাভেরও আশা পোষণ করে না। এই জন্যেই এই বাক্যের পর বলেছেন যদি আল্লাহ তা'আলার উপর ও কিয়ামতের উপর বিশ্বাস না থাকে তবে ঐ লোক-দেখানো দান, অনুগ্রহ প্রকাশ করার দান এবং কষ্ট দেয়ার দানের দৃষ্টান্ত এইরূপ যেমন এক বৃহৎ মসৃণ প্রস্তর খণ্ড, যার উপরে কিছু মাটিও জমে গেছে। অতঃপর প্রবল

বৃষ্টিপাতের ফলে সমস্ত ধুয়ে গেছে এবং কিছুই অবশিষ্ট নেই। এই দু' প্রকার ব্যক্তির দানের অবস্থাও দ্রূপ। লোকে মনে করে যে, সে দানের পুণ্য অবশ্যই পেয়ে যাবে। যেভাবে এই পাথরের মাটি দেখা যাচ্ছিল, কিন্তু বৃষ্টিপাতের ফলে ঐ মাটি দূর হয়ে গেছে, তেমনই এই ব্যক্তির অনুগ্রহ প্রকাশ করা ও কষ্ট দেয়ার ফলে এবং ঐ ব্যক্তির রিয়াকারীর ফলে ঐ সব পুণ্য বিদায় নিয়েছে। আল্লাহ পাকের নিকট পৌছে তারা কোন প্রতিদান পাবে না। আল্লাহ তা'আলা অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না। (তাফসিরে ইবনে কাসির)

রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "তোমাদের উপর আমার যে জন্য ভয় হয়, তা হচ্ছে ছোট শির্ক" সাহাবাগণ জিজ্ঞাস করলেন, "হে আল্লাহ্র রাসুল, ছোট শির্ক কি?" তিনি উত্তরে বললেন, 'রিয়া'। প্রতিফল দিবসে আল্লাহ্ যখন তাঁর বান্দাদেরকে প্রতিদান দেবেন, সেদিন তিনি তাদেরকে বলবেন, পৃথিবীতে যাদেরকে দেখানোর জন্য তোমরা নেক আমল করতে, তাদের কাছে যাও। দেখ প্রতিদান পাও কিনা।" হাদিস, মুসনাদে আহম্মদ, নং ২৭৭৪২

মুহাম্মদ ইবনে লাবীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বাহির হয়ে বললেন, "হে লোক সকল! গোপন শিরক থেকে সাবধান থাকো" সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহ্র রাসূল! গোপণ শির্ক কি?" তিনি বললেন, "যখন একজন মানুষ সালাতে দাঁড়ায় এবং খুব আগ্রহ সহকারে সুন্দরভাবে সালাত আদায় করে, কারণ মানুষ তার সালাতকে দেখছে, সেটা গোপণ শিরক।" হাদিস, মুসনাদে আহম্মদ

"হে লোক সকল! তোমরা গোপন শিরক থেকে বেঁচে থাকো! কেননা এটাতো অন্ধকার রাত্রে কালো পাথরের উপর কালো পিঁপড়ার চলাচলের চেয়েও গোপনীয় ও সুক্ষ্ম।" তফসীর ইবনে কাসীর, ১২ খন্ড, ২৪৩ পৃষ্ঠা

*মহান আল্লাহ বলেন-

وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ۗ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَٰنُ لَهُۥ قَرِينًا فَسَآءَ قَرِينًا ٣٨

"(আল্লাহ্ তা'আলা তাদের পছন্দ করেন না) যারা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তারা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না, আর শয়তান যদি কোনো ব্যক্তির সাথী হয় তাহলে সে নিকৃষ্ট সাথীই বটে।" (সুরা নিসা, আয়াত-৩৮)

এর দ্বারা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ওয়াজিব হকের ক্ষেত্রে শৈথিল্য ও কার্পণ্য প্রদর্শন করা যেমন দূষণীয়, তেমনিভাবে লোক দেখানোর জন্য এবং উদ্দেশ্যহীনভাবে ব্যয় করাও নিতান্ত মন্দ কাজ। যারা একান্তভাবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ব্যয় না করে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করে, তাদের আমল আল্লাহর দরবারে গৃহীত হয় না। হাদীসে এমন কাজকে শির্ক বলেও অভিহিত করা হয়েছে। শাদ্দাদ ইবন আওস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করল সে শির্ক করল। যে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে সিয়াম পালন করল সে শির্ক করল এবং যে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে দান-সদকা করল সে শির্ক করল।' [মুসনাদে ত্বায়ালেসী ১১২০, মুস্তাদরাকে হাকেম ৪/৩৬৫]

আমাদের সমাজে প্রচলিত বড় ও ছোট শিরক

আমাদের দেশের গ্রাম ও শহরে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়েছে শিরক, বিদ'আত ও নানাবিধ কুসংস্কার। কুসংস্কারজনিত এমন শিরক রয়েছে যা এসব দেশের লোকজন ধর্মীয় বিধান বা নিয়ম মনে করেই পালন করে থাকে। যেমন-

১. **আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো গায়েবী ক্ষমতায় বিশ্বাস করা:** আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর জগতের উপর কর্তৃত্ব রয়েছে বলে বিশ্বাস করা। যদি কেউ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সম্পর্কে এ বিশ্বাস পোষণ করে যে, সে অলৌকিক শক্তির অধিকারী এবং অলৌকিকভাবেই কোন ঘটনা সংঘটিত করতে, বিপদগ্রস্তকে সাহায্য, রোজগারহীনকে রোজগার, সন্তানহীনকে সন্তান দিতে পারে, তাহ'লে সে মুশরিক বলে গণ্য হবে।

২. **জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত :** জ্যোতির্বিদ্যা হ'ল সৌরজগতের বিভিন্ন অবস্থা পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর ঘটনা সংঘটিত হওয়ার কারণ বর্ণনা করা। জ্যোতির্বিদরা বলে থাকেন যে, অমুক নক্ষত্রের অমুক স্থানে অবস্থানের সময়ে যে ব্যক্তি বিবাহ করবে তার অমুক অমুক জিনিস অর্জিত হবে। যে ব্যক্তি অমুক নক্ষত্রের অমুক জায়গায় অবস্থানের ক্ষণে সফরে থাকবে সে ভাগ্যবান কিংবা ভাগ্যহীন হবে। যেমন- বর্তমানে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এ ধরনের অর্থহীন-আজগুবি খবরাখবর পরিবেশন করা হয়, আর এগুলোর আশে-পাশে বিক্ষিপ্ত তারকারাজি, সরলরেখা, বক্ররেখা ইত্যাদি ধরনের অাঁকা-বাঁকা রেখা অংকিত থাকে। কিছু সংখ্যক মূর্খ ও দুর্বল ঈমানের মানুষও বিভিন্ন সময় জ্যোতিষীদের নিকট গমন করে থাকে এবং তাদেরকে স্বীয় ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিবাহ-শাদী ইত্যাদি সম্পর্কেও প্রশ্ন করে থাকে।

৩. **যাদু-টোনা, বাণ মারা, বধ করা:** আমাদের সমাজে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে যদি কারো সাথে কারো শত্রুতা সৃষ্টি হয় এবং এ দু'পক্ষের কোন এক পক্ষ যদি দুর্বল হয়, তবে দুর্বল পক্ষ সাধারণত বিভিন্ন জিন সাধকের মাধ্যমে যাদুর আশ্রয় গ্রহণ করে সবল পক্ষকে বাণ মারে বা বধ করে। আবার অনেক ক্ষেত্রে সবল পক্ষও দুর্বল পক্ষকে সমূলে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে যাদুর আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। এভাবেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অধিকতর ভালবাসা

সৃষ্টি, কারো সাথে শত্রুতা সৃষ্টি, কারো বিবাহ হ'তে না দেয়া, কারও প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি, কাউকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে চলে যাদুর খেলা। আর এখানেই শেষ নয় বরং এ সকল যাদুকে নিষ্ক্রিয় করতে পুনরায় আশ্রয় গ্রহণ করা হয় যাদুমন্ত্রের। এ ক্ষেত্রে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট তথা জিন, পীর, ওলী-আওলিয়া, এমনকি হিন্দুদের দেব-দেবী প্রভৃতির নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করা, নির্দিষ্ট দিনে লাল বা কালো মোরগ জিন বা ভূতের নামে রোগীকে যবহ করতে বলা কিংবা মিষ্টি ও ফলমূল গায়রুল্লাহর নামে এমনকি হিন্দুদের মন্দীরে অবস্থিত দেব-দেবীকেও মানত করা।

৪. **রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে ধাতব পদার্থ নির্মিত আংটি ও বালা পরিধান করা:** রাজধানী সহ বিভিন্ন শহরের ফুটপাতে এবং বড় বড় পাইকারী বাজারে এমন কিছু ব্যবসায়ের দোকান পাওয়া যায়, যারা ধাতব নির্মিত আংটি ও বালা বিক্রি করে থাকে। অনেক লোকদেরকে তা বাত রোগ নিরাময়, যে কোন উদ্দেশ্য সফল হওয়া, শনি ও মঙ্গল গ্রহের কুদৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষা ইত্যাদির জন্য করে আংগুলে ও হাতে ব্যবহার করতে দেখা যায়। আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে কোন বস্ত্তই নিজস্ব গুণে কোন রোগের ক্ষেত্রে উপকারী বা অপকারী হ'তে পারে না। এতে রোগীর অন্তরে ধাতব বস্ত্তর প্রতি উপকারী হওয়ার ধারণার সৃষ্টি হয় এবং রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে আল্লাহর পরিবর্তে বস্ত্তর উপর ভরসা করা হয়। তাই কোন বস্ত্তকে কোন ক্ষেত্রে উপকারী বা অপকারী ধারণা করে ব্যবহার করা।

৫. **জিন বা অপর কোন রোগের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষার জন্য শরীরে তা'বীয ব্যবহার করা:** জিনের অশুভ দৃষ্টি এবং বিভিন্ন রোগের অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য সাধারণ মুসলিমদের মাঝে তা'বীয ব্যবহার একটা সাধারণ রীতিতে পরিণত হয়েছে। অথচ সকল ধরনের তা'বীয ব্যবহার করা শিরক।

৬. **মাযার স্পর্শ করা, শরীর মাসেহ করা বা চুমু খাওয়া, কবরের মাটি বরকতের নিয়তে নিয়ে তা'বীযে করে গলায় বাঁধা, গায়ে মালিশ করা, রওযা শরীফ, মাযার বা কবর ইত্যাদির ছবি বরকতের জন্যে রাখা, চুমু খাওয়া, সম্মান করা:** বিপদাপদ, বালা-মুছীবাত থেকে বাঁচার জন্য ঘর-বাড়িতে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে বরকতের জন্য দোকান, অফিস, হোটেলে ছবি রেখে আদবের সাথে দাঁড়িয়ে এগুলো করা।

৭. **কবর ধোয়া পানি :** মাযারকে মাঝে মাঝে মহা ধুমধামের সাথে গোসল করানো হয়। আর এ কবর ধোয়া পানি বোতলে করে নিয়ে যাওয়া এবং নেক মাকসূদ পূরণের নিয়তে পান করা।

৮. **মাযারে গিলাফের তা'যীম :** বিভিন্ন পীর, ওলী-আওলিয়া, বুযুর্গানে দ্বীনের মাযারে বা কবরের ওপরে আজকাল গিলাফ পরানো হয়। নির্দিষ্ট সময়ের পর এ গিলাফ পরিবর্তন করে আবার নতুন গিলাফ পরানো হয়। পুরানো গিলাফ অতি যত্ন সহকারে সংরক্ষণ করা হয়। অজ্ঞ, অশিক্ষিত মানুষ অনেক ক্ষেত্রে এসব গিলাফে চুমু খায়, গিলাফ ধরে ফরিয়াদ জানায়, আদবের সাথে মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, এ গিলাফের সুতা তা'বীযে ভরে গলায় বাঁধে। এমনকি অনেকেই আরো একধাপ এগিয়ে গিলাফের কাছেই দো'আ চেয়ে বসে।

৯. **ওরশ :** অনেক মাযারে ও পীরের দরবারে অমাবস্যা, পূর্ণিমা, পীরের জন্ম বা মৃত্যু তারিখ নির্দিষ্ট করে ওরশ হয়ে থাকে। বিজলী বাতি, গেট, চকমকি কাগজ ইত্যাদি দিয়ে প্যান্ডেল, স্টেজ সাজানো হয়। বেপর্দা অবস্থায় নারী-পুরুষ একত্রে বসে যিকির করে, কাওয়ালী-সামা শোনে। ভন্ড পীর, ফকীররা এ সব ওরশে ওয়ায নসীহ'তের নামে শরী'আত বিরোধী আক্বীদা-বিশ্বাস প্রচার করে। শাহী তবারক রান্না করা হয়। ওরশের পরে যে টাকা অবশিষ্ট থেকে যায়, তা পীর ও তার খাদেমদের পকেটে চলে যায়। ওরশ মূলতঃ আনন্দোৎসব ও টাকা উপার্জনের পন্থা হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

১০. **খাজা বাবার ডেগ :** একদল লোক বিশেষত যুবকেরা রজব মাস এলেই পথে-ঘাটে, বাজারে যেখানেই সুযোগ পায় সেখানেই একটা ডেগ বা বড় হাড়ি বসায়। লালসালু কাপড় বিছিয়ে, বাঁশ দিয়ে ছাউনি দিয়ে, বিজলী বাতি জ্বালিয়ে, চকমকি কাগজ এবং বিভিন্ন ধরনের রং লাগিয়ে ঘর সাজিয়ে তার মধ্যে স্থাপন করে ডেগ। তারা একে বলে 'খাজা বাবার ডেগ্ম।

১১. **প্রাণীর ছবি, চিত্র, প্রতিকৃতি, মূর্তি, ভাস্কর্য ইত্যাদির হুকুম :** কোন নেতা, লিডার বা স্মরণীয়-বরণীয় ব্যক্তিবর্গের ছবি, চিত্র, প্রতিকৃতি, মূর্তি ভাস্কর্য ইত্যাদি তৈরি করা, মাঠে-ঘাটে, অফিস-আদালতে ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এগুলো স্থাপন করা, এগুলোকে সম্মান করা, এগুলোর উদ্দেশ্যে পুষ্পস্তবক অর্পণ ইত্যাদি করা।

১২. **সমাধি, স্মৃতিস্তম্ভ, শহীদ মিনার :** সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের স্মরণে সমাধি, স্মৃতিস্তম্ভ, স্মৃতিসৌধ বা শহীদ মিনার নির্মাণ, এগুলোকে সম্মান জানানো, সামনে দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা ইত্যাদি।

১৩. **অগ্নিপূজা এবং শিখা চিরন্তন, শিখা অনির্বাণ** ঃঅগ্নি শিখা' অগ্নিপূজকের উপাস্য দেবতা। তারা ভক্তি, প্রণাম ও নানা কর্মকান্ডের দ্বারা আগুনের পূজা করে থাকে। এ অগ্নিপূজা সম্পূর্ণ শিরক ও আল্লাহদ্রোহী কাজ। 'শিখা চিরন্তন' বা 'শিখা অনিবার্ণের' নামে অগ্নি মশালকে সারা দেশে ঘুরিয়ে ভক্তি শ্রদ্ধা জানানো এবং এগুলোর প্রজ্জ্বলনকে অব্যাহত রাখার জন্য বিশেষ ধরনের বেদীর ওপর এগুলো স্থাপন করা, অলিম্পিক মশাল সহ বিভিন্ন ক্রীড়ানুষ্ঠানের মশাল প্রজ্জ্বলনও শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

১৪. **মঙ্গল প্রদীপ :** হিন্দুদের অনুকরণে কোন অনুষ্ঠানের শুরুতে বা কোন প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন উপলক্ষে মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে বিশেষ আনুষ্ঠানিকতা পালন করা।

১৫. **তাছাওউফের শায়েখ বা পীরের কল্পনা :** তাছাওউফের শায়খ বা পীরের চেহারা, আকৃতি ইত্যাদি কল্পনা করে মোরাকাবা, ধ্যান, যিকির বা অন্য যে কোন ইবাদত করা শিরক।

১৬. **পীরকে দূর হ'তে ডাকা :** অনেকে স্বীয় পীর বা কোন বুযুর্গ ব্যক্তিকে বহুদূর হ'তে ডাকে এবং মনে করে যে, তিনি এটা জানতে ও শুনতে পারছেন। অনেক সময় 'ইয়া গাওছুল আযম'ঃইয়া খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী' ইত্যাদি বলে ডাকতে থাকে এবং নিজেদের ফরিয়াদ পেশ করতে থাকে।

১৭. **পীরের জন্য ঘর সাজিয়ে রাখা :** কিছু সংখ্যক পীরের অনুসারীরা তাদের বাড়ির মধ্যে একটি ঘর পীরের জন্য সারা বছর সাজিয়ে গুছিয়ে রাখে। একটা বড় খাটের ওপর চাদর বিছিয়ে বড় বড় কয়েকটা কোল বালিশ সেট করে 'বিশেষ আসন' তৈরি করা হয়। পীরের ছবিকে মালা পরিয়ে সযত্নে ঐ ঘরে টাঙ্গিয়ে রাখা হয়। ফুল ও জরি দিয়ে ঘরটি সুন্দর করে সাজানো হয়। সারা বছর ঐ ঘরে কাউকে ঢুকতে দেয়া হয় না। মাঝে মাঝে মুরীদরা ঐ ঘরে ঢুকে ছবি ও আসনের সামনে আদবের সাথে চুপ করে বসে থাকে।

১৮. **পীরের বাড়ির বা আস্তানার খাদেম, গরু, কুকুর, বিড়াল, মাছ ও কচ্ছপ ইত্যাদির প্রতি অন্ধ সম্মান :** অনেককে দেখা যায়, পীরের বা মাযারের খাদেম, গরু, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদিকে দেখামাত্র দাঁড়িয়ে যায়। এগুলোর সামনে মূর্তির ন্যায় দাঁড়িয়ে থাকে। অনেকে আবার এসব গরু, কুকুর, বিড়ালের পা ধরে বসে থাকে নেক মাকছূদ পূরণের জন্য।

১৯. **পীর, ওলী-আওলিয়াদের কবরের মাটি ও সেখানে জ্বালানো মোম বিভিন্ন রোগের জন্য উপকারী মনে করা :** এ ধরনের কর্ম আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে অহরহ পরিলক্ষিত হয়। তারা বিভিন্ন রোগের ক্ষেত্রে আউলিয়াদের কবরের মাটি ও সেখানে জ্বালানো মোমবাতি অনেক উপকারী মহৌষধ মনে করে অত্যন্ত যত্নের সাথে তা ব্যবহার করে থাকে এবং এর দ্বারা কোন রোগ মুক্তি হ'লে তা কবরস্থ ব্যক্তির দান বা তাঁর ফয়েয বলে মনে করে।

২০. **গায়রুল্লাহর নামে যিকির বা অযীফা :** আল্লাহর যিকিরের ন্যায় কোন নবী বা রাসূল, পীর, ওলী-আওলিয়া, বুযুর্গ, আলিমের নাম জপ করা, বিপদের পড়লে তাদের নামের অযীফা পড়া। যেমন- 'ইয়া রাহমাতুল্লিল আলামীন',ওইয়া রাসূলাল্লাহ',ওনূরে রাসূল, নূরে খোদা',ওহক বাবা, হক বাবা' ইত্যাদি।

২১. **কামেল পীরের গোনাহ নেই :** খোদা পাক, কামেল পীরও পাক। তাদের কোন গোনাহ নেই। তারা নিষ্পাপ। এ ধরনের কথা বলা ও বিশ্বাস করা।

২২. **পীরের পায়ে সিজদা করা বা কদমবুসি করা :** সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে পীরের পায়ে সিজদা করা বা নেক মাকছূদ পূরণের জন্য, রোগমুক্তির নিয়তে পীরের পা চাটা, পায়ে চুমু খাওয়া, গাড়ি চাটা, দাড়িতে চুমু খাওয়া, ব্যবহার্য থালাবাটি বা অন্য কোন বস্তত চাটা বা চুমু খাওয়া, মাযারে চুমু খাওয়া।

২৩. **আল্লাহর সত্তার সাথে মিশে যাওয়া :** অনেকের ধারণা মুরীদ যখন 'ফানাফিল্লাহ' পর্যায়ে পৌঁছে, তখন সে আল্লাহর সত্তার সাথে মিশে বিলীন হয়ে যায় এবং তাঁর পৃথক কোন অস্তিত্ব থাকে না। খাওয়া, ঘুম, স্ত্রী সহবাস সহ যাবতীয় কাজকর্ম তখন আর নিজস্ব থাকে না। এগুলো সব আল্লাহর হয়ে যায় অর্থাৎ এ সব কাজ আল্লাহ নিজেই করেন। (নাঊযুবিল্লাহ)

২৪. **আল্লাহ যা করান, তাই করি :** একদল ফকীর বলে, আল্লাহ যা করান, তা-ই করি। আল্লাহ ছালাত আদায় করান না, তাই আদায় করি না , আল্লাহ গাঁজা টানাচ্ছেন, তাই টানি। তাক্বদীরে ছালাত থাকলে তো আদায় করব।

২৫. **দিলে দিলে ছালাত পড়ি :** অনেক পীর ছালাত, ছওমের ধার ধারে না; কিন্তু খুব সাধনা করে! দু'তিন দিন পর পর একটু খায়। কম কথা বলে। লোকজনের সাথে কম মিশে। দিনের বেশিরভাগ সময় চুপ করে ধ্যান মগ্ন অবস্থায় বসে থাকে। এরা বলে, আমরা দিলে দিলে ছালাত পড়ি। তোমরা মাত্র ৫ ওয়াক্ত পড়, আর আমরা সারা দিন-রাতই ছালাত পড়ি।

২৬. **সীনায় সীনায় মা'রেফতী :** পীর বা দরবেশ দাবীদার একদল লোক বলে থাকে, কুরআন শরীফ মোট ৪০ পারা। ৩০ পারায় যাহেরী ইলমের বিষয় আছে। বাকি ১০ পারা মারেফতী বিদ্যায় ভরা রয়েছে। এ ১০ পারা আমরা সীনায় সীনায় পেয়েছি। শরী'আতের আলেমরা এগুলোর খবর রাখেন না।

২৭. **শরী'আতের ইত্তেবা সর্বাবস্থায় ফরয নয় :** অনেকের ধারণা, মুরীদ যখন মা'রেফাতের উচ্চ শিখরে পৌঁছে যায়, তখন তার জন্য শরী'আতের হুকুম-আহকাম, ছালাত, ছওম ইত্যাদি মাফ হয়ে যায়।

২৮. **শিরকের গন্ধযুক্ত নাম বা সম্বোধন :** যে সকল নাম বা সম্বোধনে শিরকের সংস্পর্শ পাওয়া যায়, সেগুলোকে ইসলাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। জাহেলী যুগে মানুষ নিজের সন্তান-সন্ততির নাম সূর্য, চন্দ্র ইত্যাদির নামের সাথে সম্পৃক্ত করে রাখত। যেমন- আবদে শামস্ বা সূর্যের গোলাম, আবদে মানাফ বা মানাফের গোলাম ইত্যাদি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ ধরনের নাম রাখতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

২৯. **শিরকের গন্ধযুক্ত উপাধি :** পীর বা ওলীকে এমন কোন উপাধিতে সম্বোধন করা উচিত নয় যা অর্থগত দিক দিয়ে আল্লাহ তা'আলার জন্য প্রযোজ্য। যেমন- গাউছুল আযম (সর্বশ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী), গরীবে নেওয়াজ (গরীবরা যার মুখাপেক্ষী), মুশকিল কোশা (যার মাধ্যমে বিপদাপদ দূর হয়), কাইয়ূমে যামান (যামানা কায়েম করেছেন যিনি) ইত্যাদি।

৩০. **সন্তানের নামকরণে নবী ও পীর-আওলিয়ার সাথে সম্পর্ক স্থাপন :** গোলাম মুছত্বফা (মুছত্বফার গোলাম), আব্দুন্নবী (নবীর দাস), আব্দুর রাসূল, আলী বখশ (আলী (রা:)-এর দান), হোসেন বখশ (হুসাইন (রা:)-এর দান), পীর বখশ (পীরের দান), মাদার[১] বখশ (মাদারের দান), গোলাম মহিউদ্দীন (পীর মহিউদ্দীনের গোলাম), আব্দুল হাসান (হাসানের গোলাম), আব্দুল হুসাইন (হুসাইনের গোলাম), গোলাম রাসূল (রাসূলের গোলাম), গোলাম সাকলায়েন ইত্যাদি নাম রাখা।

৩১. **বিপদে পড়লে জিন, ফেরেশতা, পীর, ওলী-আওলিয়াদের ডাকা :** দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ মূর্খ, পীর ও মাযার পূজারী অনেক লোককে দেখা যায় বিপদে-আপদে, রোগে-শোকে আল্লাহ তা'আলাকে বাদ দিয়ে পীর, ওলী, জিন ও ফেরেশতাদের আহবান

করতে থাকে। যেমন- 'ইয়া গাওছুল আযম বড় পীর আব্দুল কাদের জীলানী',ৃইয়া খাজা বাবা',ৃইয়া সুলতানুল আওলিয়া',ৃহে পীর কেবলাজান',ৃহে জিন',... আমাকে রক্ষা করুন, আমাকে বিপদ হ'তে বাঁচান, আমার মাকছূদ পূরা করুন, সন্তান দিন ইত্যাদি। কোন কোন মূর্খলোক বালা মুছীবতের সময় বুযুর্গ লোকদের উদ্দেশ্যে দো'আ করে, ফরিয়াদ জানায়। এভাবে গাইরুল্লাহকে ডাকা এবং তাদের কাছে নিজের ফরিয়াদ পেশ করা, তা কাছ থেকে হোক আর দূর থেকেই হোক।

৩২. **পীর, ওলী-আওলীয়াদের স্মৃতিচিহ্নের তা'যীম করা এবং এদের কাছে গায়েবী সাহায্য চাওয়া :** অনেকে পীর, ওলী-আওলিয়াদের স্মৃতিচিহ্নকে এমন তা'যীম করে যে তা শিরকের পর্যায়ে পৌঁছে যায়। পীর হয়তো কোন গাছের নীচে বসতেন, বিশ্রাম করতেন। পীরের মৃত্যুর পর মুরীদরা ঐ গাছ বা পাথরের গোড়ায় আগরবাতি, মোমবাতি, ধূপ ইত্যাদি জ্বালায়, মীলাদ পড়ায়, বিপদ মুক্তির জন্য ফরিয়াদ জানায়। খানজাহান আলীর মাযারের পুকুরে কুমীর আছে, চট্টগ্রামে কথিত বায়েজীদ বোস্তামীর মাযারে কচ্ছপ আছে। আবার কোন কোন জায়গায় গজার মাছ, জালালী কবুতর ইত্যাদি পীর-ওলীদের স্মৃতি বহন করছে বলে মানুষের বিশ্বাস। অজ্ঞ অশিক্ষিত মানুষেরা মাযারের ব্যবসায়ী খাদেমদের খপ্পরে পড়ে এ সব কচ্ছপ, গজার মাছ, কুমীর, জালালী কবুতর ইত্যাদিকে অলৌকিক ক্ষমতাসম্মন্ন মনে করে এবং এদের জন্য বিভিন্ন খাদ্যবস্ত্ত পূজাস্বরূপ নিয়ে যায় ও এদের কাছে সাহায্যে প্রার্থনা জানায়।

৩৩. **মন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ভাগ্য পরিবর্তন :** সিলভা, কোয়ান্টাম বা অন্য কোন মেথডের (পদ্ধতি) দ্বারা মন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটানো এবং সকল সমস্যার সমাধান লাভ করার মাধ্যমে জীবনে সফলতা অর্জন করার কথা বলা।

৩৪. **কপালে টাকা স্পর্শ করে তা সম্মান করা :** টাকা-পয়সা মানুষের সম্পদ। তা মানুষের জীবনের প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ফলে টাকা-পয়সা মানুষের খাদিম। অথচ মানুষ টাকার খাদিম বা গোলাম নয়। সম্পদের সম্মান হচ্ছে তাকে সংরক্ষণ করা, তাকে অবজ্ঞা ও তুচ্ছ জ্ঞান না করা। পায়ের নিচে ফেলে এটাকে দলিত-মথিত না করা। মাথা ও কপাল ঠেকিয়ে আল্লাহর ইবাদত করা হয় এবং তাঁকে সম্মান জানানো হয়। তাই কপালে টাকা স্পর্শ করে টাকাকে সম্মান করা বা 'গড়হবু রং ঃযব ঝবপড়হফ এড়ফ্থ বলা টাকাকে পূজা করারই শামিল। এ কাজটি অনেক মুসলিম ব্যবসায়ীদের মাঝে পরিলক্ষিত হয়। দোকান খোলার পর প্রথম বিক্রি হ'লেই তারা এ কাজটি করে থাকে।

৩৫. **গ্রহ নক্ষত্রের তা'ছীর (প্রভাব) :** অনেকের ধারণা মানুষের ভাল-মন্দ, বিপদ-আপদ, উন্নতি-অবনতি ইত্যাদি গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাবে হয়। কেউ বিপদে পড়লে বলা হয়,ৃএ ব্যক্তির ওপর শনি গ্রহের প্রভাব পড়েছে'। কারো আনন্দের খবর শুনলে বলা হয়ে থাকে,ৃএ ব্যক্তি মঙ্গল গ্রহের নজরে সু নজরে আছে'।

৩৬. **চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের প্রভাব :** অনেকের ধারণা চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ মানুষের ভাল-মন্দ, জন্ম-মৃত্যু, বিপদ-আপদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে।

৩৭. **কোন মাস বা সময়কে ভাল বা খারাপ জানা :** আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ সময় ও দিনক্ষণের ভালমন্দে বিশ্বাসী। মুহাররম, কার্তিক প্রভৃতি মাসে বিয়েশাদী করা উচিত নয়, রবি ও বৃহস্পতিবারে বাঁশ কাটা যায় না, সোম ও বুধবারে গোলা হ'তে ধান বের করা যায় না, শুক্র ও রবিবারে পশ্চিম দিকে যাত্রা করলে ক্ষতি হবে, শনি ও মঙ্গলবারে বিয়ে করা ও ঝাড়ু বাঁধা উচিত নয়, রাতের বেলা ঝাড়ু দিলে আয় উন্নতি হয় না, রাতে আয়না দেখলে কঠিন পীড়া হয়, রাতে নখ কাটা ঠিক নয়, নতুন বউকে ভাদ্র মাসে শ্বশুর বাড়ীতে রাখা হয় না (কারণ নতুন বছরের পা ভাদ্র মাসে শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর জন্য দেখা অকল্যাণকর), ভাদ্র ও পৌষ মাসে মেয়ে লোকের সওয়ারী পাঠানো যায় না, আশ্বিন মাস যাবার দিন মুটে বানিয়ে গরুকে গা ধৌত করা ও 'গো ফাল্গুন' বলে মান্য করা ইত্যাদি।

৩৮. **নব জাতকের জন্য :** নব জাতকের হাতে চামড়ার চিকন তার বা তাগা বা গাছ বা এ ধরনের অন্য কোন কিছু চুড়ির মতো করে বেঁধে দেয়া হয় যাতে কোন অশুভ রোগ-বালাই বা বদ জিন-ভূত স্পর্শ করতে না পারে। আবার নবজাত শিশুকে জিনের অশুভ দৃষ্টি থেকে রক্ষার জন্য বাচ্চার কান ছিদ্র করা, বাচ্চার বালিশের নিচে জুতার টুকরা রাখা অথবা শিশুর মাথার চুল না কাটা। চোখ লাগা থেকে শিশুসন্তানকে রক্ষার জন্য সন্তানের গলায় মাছের হাড়, শামুক ইত্যাদি ঝুলিয়ে রাখা, কপালে কালো টিপ বা দাগ দেয়া।

৩৯. **গায়রুল্লাহর নামে কসম করা :** আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি গায়রুল্লাহর নামে কসম করল, সে কুফরী করল অথবা শিরক করল'। *তিরমিযী, হা/১৫৩৫* মূলত আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন নামে কসম করলে কসম হয় না। যেমন- রাসূলুল্লাহর কসম, কা'বা শরীফের কসম, নিজ চোখের কসম, বিদ্যা বা বই এর কসম ইত্যাদি।

৪০. **আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য পীর, ওলী বা বুযুর্গ ব্যক্তির অসীলা গ্রহণ :** আল্লাহকে পাওয়ার জন্য, তাঁর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভের লক্ষ্যে, ক্ষমা ও সাহায্য পাওয়ার আমার কোন জীবিত বা মৃত পীর, ওলী বা বুযুর্গ ব্যক্তিকে অসীলা বা মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা।

৪১. **শুভ-অশুভ আলামত :**বাহ্যিক দৃষ্টিতে কোন বস্তুত, স্থান, শব্দ বা সংকেতকে পসন্দ করা বা না করা মানুষের মানবীয় স্বভাব। এটা দোষের কিছু নয়। তবে ভালকে নিশ্চিতভাবে ভাল এবং মন্দকে অকল্যাণকর বলে জানতে হ'লে শরী'আতের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রয়োজন। তাওহীদের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে শুভ-অশুভ আলামতে বিশ্বাস করা স্পষ্টভাবে শিরকের পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ দ্বারা এ বিধানটি আরও দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হয়। এ হাদীসে রাসূল (ছাঃ) বলেন,অশুভ বা অযাত্রা

বিশ্বাস করা বা নির্ণয়ের চেষ্টা করা শিরক, কথাটি তিনবার বলেন'। *আবূ দাউদ, ৪/১৭*পাখি ও প্রাণীর চলাচলের গতিপথকে প্রাক-ইসলামী যুগে বসবাসকারী আরব দেশের লোকেরা সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের আলামত বলে গণ্য করত এবং তাদের জীবনের পরিকল্পনা গ্রহণের প্রক্রিয়া এ সব আলামতকে ঘিরেই কেন্দ্রীভূত ছিল। শুভ বা অশুভ আলামত নির্ধারণের এই চর্চাকে আরবীতে তিয়ারা*।১।* (উড়াল দেয়া) বলা হ'ত। যেমন, কোথাও যাবার উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি যাত্রা শুরু করলে যদি একটি পাখি তার উপর দিয়ে উড়ে বামে চলে যেত, তাহ'লে সে ভাবত যে তার দুর্ভাগ্য অবশ্যম্ভাবী; ফলে সে পুনরায় ঘরে ফিরে যেত। ইসলাম এ ধরনের সকল কুপ্রথাকে বাতিল করেছে।সকল মুসলিমকে এ ধরণের বিশ্বাস হ'তে উদ্‌ভূত অনুভূতিকে পরিহার করতে বিশেষভাবে যত্নশীল হ'তে হবে। এ ক্ষেত্রে অজ্ঞাতসারে যদি কেউ কোন কাজে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে যা এ প্রকৃতির বিশ্বাসের সাথে সংশ্লিষ্ট, তাহলে অবশ্যই আল্লাহর নিকটে এর থেকে পরিত্রাণ চেয়ে নিম্নের দো'আ দ্বারা আকুল প্রার্থনা জ্ঞাপন করা উচিত: اَللَّهُمَّ لاَ خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُكَ وَلاَ طَيْرَ إِلاَّ طَيْرُكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ অর্থ: হে আল্লাহ্! আপনার কল্যাণ ব্যতীত কোন কল্যাণ নেই এবং আপনার দেয়া শুভাশুভত্ব ব্যতীত কোন শুভ বা অশুভ নেই এবং আপনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। *আহমাদ, ২/২২০; আলবানী, সিলসিলা ছহীহাহ, হা/১০৬৫; সনদ সহীহ।* শুভ-অশুভ আলামত বিষয়ে বেশি রকমের বাড়াবাড়ি করা নিরর্থক। বৃহৎ শিরকের উৎসমূলে পরিণত হওয়ার আশংকায় ইসলাম এ ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্বারোপ করে। মূর্তি, মানুষ, তারা, সূর্য ইত্যাদি পূজার উৎপত্তি হঠাৎ করে হয়নি। এ ধরনের পৌত্তলিকতার চর্চা দীর্ঘকালব্যাপী ক্রমান্বয়ে বিকাশমান হয়েছে। বৃহৎ শিরকের শিকড় যত বিস্তার লাভ করে, আল্লাহর একত্বের প্রতি মানুষের বিশ্বাস ক্রমশ বিলুপ্ত হ'তে থাকে। এভাবে শয়তানের কুমন্ত্রণার বীজ অঙ্কুরিত হয়ে মুসলিমদের বিশ্বাসের ভিত্তিমূল ধ্বংস করার পূর্বেই তা সমূলে উৎখাত করতে হবে। (www.at-tahreek.com)

শিরক সম্পর্কে সর্বদা মনে রাখার মতো কথা

১. জীবন বিপন্ন হলেও শিরক করা যাবে না,

২. শিরকের পাপের কোন ক্ষমা নেই,

৩. শিরকের পরিণতি ধ্বংস,

৪. শিরক সমস্ত নেক আমলকে বিফল করে দেয়,

৫. মুশরিকরা চিরস্থায়ী জাহান্নামী,

৬. মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নিষেধ,

৭. শিরক মিশ্রিত ঈমান কখনোই ঈমান হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়,

৮. শিরক অতি সন্তর্পনে আগমন করে।

সুতরাং, শিরক থেকে বেঁচে থাকার জন্য সবসময় আল্লাহ তা'আলার নিকটে প্রাণখুলে দো'আ করা ও সাহায্য প্রার্থনা করা কর্তব্য। রাসূল (ছাঃ) শিরক হ'তে বাঁচার জন্য আমাদেরকে দো'আ শিখিয়েছেন:

اَللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوْذُبِكَ أَنْ نُشْرِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لاَ نَعْلَمُ

অর্থ: হে আল্লাহ্, জেনে বুঝে শিরক করা থেকে আমরা আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং আমাদের অজ্ঞাত শিরক থেকে আপনার নিকটে ক্ষমা চাচ্ছি। *(আহমাদ ও আত্ব-ত্বাবারানী কর্তৃক সংগৃহীত)*

আল্লাহ আমাদের সবাইকে ছোট-বড় সকল প্রকার শিরক হ'তে রক্ষা করুন, আমীন!

(www.at-tahreek.com)

দুনিয়াতে শিরকের প্রভাব:

শিরক, ইসলামের দৃষ্টিতে সবচেয়ে বড় পাপ। এটি আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে অংশীদার করা, অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ইবাদত করা। শিরকের প্রভাব শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক জীবনেই নয়, ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনেও বিস্তৃত।

ব্যক্তিগত জীবনে শিরকের প্রভাব

- মনের অশান্তি: শিরক ব্যক্তির মনে এক ধরনের অস্থিরতা ও অশান্তি সৃষ্টি করে। আল্লাহর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরতা না থাকায় মানুষ সবসময় অনিশ্চিততার মধ্যে থাকে।
- ভয় ও আতঙ্ক: শিরকের কারণে মানুষ বিভিন্ন অদৃশ্য শক্তি বা প্রেতাত্মার প্রতি ভয় পায়, যা তাদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে।
- অন্ধবিশ্বাস: শিরককারীরা বিভিন্ন অন্ধবিশ্বাসে আক্রান্ত হয় যেমন, তাবিজ, টোটকা, জ্যোতিষ ইত্যাদি।
- মানসিক রোগ: দীর্ঘদিন শিরকে লিপ্ত থাকলে মানসিক রোগের শিকার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- আত্মীয়স্বজনের সাথে সম্পর্কের অবনতি: শিরকের কারণে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয় এবং পারিবারিক সম্পর্ক খারাপ হয়ে যায়।

সামাজিক জীবনে শিরকের প্রভাব

- সামাজিক অস্থিরতা: শিরক সমাজে অস্থিরতা সৃষ্টি করে। বিভিন্ন ধরনের অন্ধবিশ্বাসের কারণে সমাজে মতবিরোধ এবং সংঘর্ষ দেখা দেয়।

- উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত: শিরকের কারণে মানুষ উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকে এবং সমাজের উন্নতি বাধাগ্রস্ত হয়।
- অর্থনৈতিক ক্ষতি: শিরকের কারণে অনেকে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় প্রতারণার শিকার হয়ে অনেকে তাদের সম্পদ হারায়।
- শিক্ষা ব্যবস্থার অবনতি: শিরকের কারণে শিক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে। অনেকে শিক্ষার পরিবর্তে অন্ধবিশ্বাসে মগ্ন থাকে।

ধর্মীয় জীবনে শিরকের প্রভাব

- ইসলামের মূল ভিত্তি দুর্বল: শিরক ইসলামের মূল ভিত্তি তাওহীদকে দুর্বল করে।
- ইসলামী সমাজে বিভক্তৃতা: শিরক ইসলামী সমাজে বিভক্তৃতা সৃষ্টি করে। বিভিন্ন ধরনের শিরকের কারণে মুসলমানরা বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে।
- ইসলামের প্রতি ঘৃণা: শিরকের কারণে অনেকে ইসলামের প্রতি ঘৃণা পোষণ করে।

শিরক একটি মারাত্মক রোগ যা ব্যক্তি, সমাজ এবং ধর্মের জন্য ক্ষতিকর। এই রোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমাদের সকলকে সচেতন হতে হবে এবং ইসলামের মূল ভিত্তি তাওহীদকে জীবনে প্রয়োগ করতে হবে।

শিরক থেকে বাঁচার উপায়:

- আল্লাহর একত্ববাদে দৃঢ় বিশ্বাস: আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, এই বিশ্বাসকে হৃদয়ে স্থাপন করতে হবে।
- কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন যাপন: কুরআন ও সুন্নাহ আলোকে আমাদের জীবন গঠন করতে হবে।
- সৎসঙ্গ: সৎমানুষদের সঙ্গে মেলামেশা করতে হবে।
- ইলম অর্জন: ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হবে।
- শিরকের কুফল সম্পর্কে চিন্তা করা: শিরকের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা করে নিজেকে সংশোধন করতে হবে।

উপসংহার:

একজন মুসলিমের উপর কর্তব্য ছোট শির্ক বা বড় শির্ক সকল শির্কের ব্যাপারে সাবধান থাকা। কেননা শির্ক হচ্ছে- আল্লাহ্‌র সবচেয়ে বড় অবাধ্যতা, তাঁর অধিকারে সীমালঙ্ঘন করা। আল্লাহ্‌র অধিকার হচ্ছে- নিরঙ্কুশভাবে তার ইবাদত করা।

আল্লাহ্‌ তাআলা মুশরিকদের জন্য স্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকাকে আবশ্যক করেছেন এবং জানিয়েছেন যে, তিনি তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। তাদের জন্য জান্নাতকে হারাম করে দিয়েছেন। আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন:

إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْماً عَظِيماً

নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তাঁর সাথে শির্ক করাকে ক্ষমা করবেন না। এর চেয়ে লঘু গুনাহ যার জন্য ইচ্ছা ক্ষমা করে দিবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে শির্ক করে সে মহা পাপে লিপ্ত হয়।

[সূরা নিসা, আয়াত: ৪৮]

তিনি আরও বলেন:

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ المائدة

(নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে শির্ক করে আল্লাহ্‌ তার জন্য জান্নাতকে হারাম করে দিয়েছেন। জাহান্নামই তার আবাসস্থল। আর জালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই।)[সূরা মায়িদা, আয়াত: ৭২]

তাই প্রত্যেক আকলবান ও দ্বীনদার ব্যক্তির উপর আবশ্যক নিজের ব্যাপারে শির্কে লিপ্ত হওয়াকে ভয় করা এবং নিজের প্রভুর কাছে শির্ক থেকে মুক্ত থাকার জন্য দোয়া করা যেমনিভাবে ইব্রাহিম (আঃ) দোয়া করে বলেছেন:

وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الأَصْنَامَ إبراهيم

আমাকে এবং আমার সন্তানদেরকে মূর্তিপূজা থেকে বাঁচান)[সূরা ইব্রাহিম, আয়াত: ৩৫]

এজন্য জনৈক সলফে সালেহীন বলতেন: "ইব্রাহিম আলাইহি সালামের পর আর কোন ব্যক্তি নিজেকে নিরাপদ ভাবতে পারে।" তাই একজন বিশ্বস্ত বান্দা শির্ককে ভয় করা ছাড়া গত্যন্তর নেই এবং তার প্রভুর কাছে তার তীব্র আগ্রহ হবে তিনি যেন তাকে শির্ক থেকে মুক্ত রাখেন। বান্দা ঐ সুমহান দোয়াটি করতে থাকবে যে দোয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিখিয়েছেন: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم (হে আল্লাহ্‌! জ্ঞাতসারে আপনার সাথে শির্ক করা থেকে আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি এবং অজ্ঞাতসারে করে ফেললে ক্ষমা চাচ্ছি।)

[আলবানী 'সহিহুল জামে' গ্রন্থে (৩৭৩১) হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।

বড় শির্ক ও ছোট শির্ক দুটোর হুকুমগত পার্থক্য হচ্ছে, বড় শির্ক ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয়। বড় শির্কে লিপ্ত ব্যক্তির উপর ইসলাম ত্যাগ ও মুরতাদ হয়ে যাওয়ার হুকুম দেয়া হয় এবং সে কাফের ও মুরতাদ হয়ে যায়।

পক্ষান্তরে, ছোট শির্ক ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয় না। বরং কখনও কখনও কোন মুসলিম ছোট শির্কে লিপ্ত হয়ে যেতে পারে। তবুও সে ইসলামের উপরেই থাকবে। তবে ছোট শির্কে লিপ্ত ব্যক্তি ভয়াবহ শংকার মধ্যে রয়েছে। কেননা ছোট শির্ক কবিরা গুনাহ। ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন: "আমি আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা শপথ করা আমার কাছে অন্য কোন সত্তার নামে সত্য শপথ করার চেয়ে অধিক প্রিয়।" তিনি অন্য কোন সত্তার নামে শপথ করাকে (যেটা হচ্ছে ছোট শির্ক) আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা শপথ করার চেয়ে জঘন্য নির্ধারণ করেছেন। অথচ এটি সুবিদিত যে, আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা শপথ করা কবিরা গুনাহ। (www.islamqa.info)

আমরা আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করছি তিনি যেন আমাদের অন্তরগুলোকে তাঁর দ্বীনের উপর অবিচল রাখেন যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা তাঁর সাথে সাক্ষাত করি। আমরা মহান আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় চাচ্ছি তিনি যেন, আমাদেরকে পথভ্রষ্ট না করেন। নিশ্চয় তিনি চিরঞ্জীব; যিনি মৃত্যুবরণ করবেন না; জ্বিন ও ইনসান মৃত্যুবরণ করবে। আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ ও সবচেয়ে প্রজ্ঞাবান এবং তাঁর কাছেই প্রত্যাবর্তন।